Vol. 22 | No. 2 | 1979

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আদ্য-পরিচয় শেখ জাহেদ (প্রণীত ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দ)

Volume	22
Issue	2
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ এনামুল হক
Published online	June 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v22i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v22i2.1
Pages	1-108
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

শেখ জাহেদ প্রণীত 'আদ্য-পরিচয়' (১৪৯৮) পুঁথির পাণ্ডুলিপির চিত্রানুলিপি

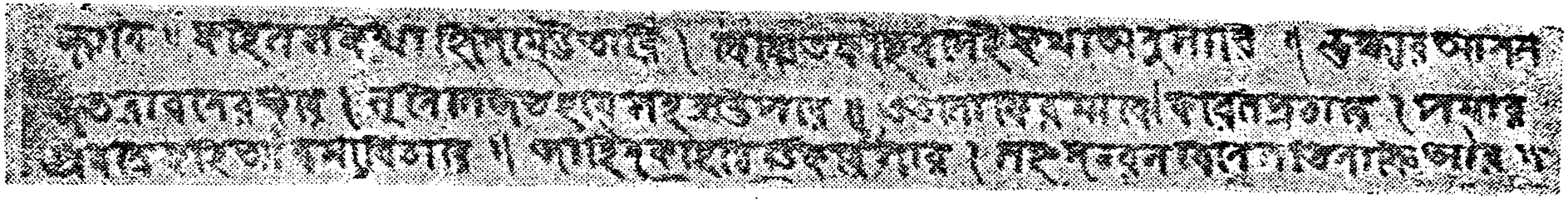

কালজ্ঞাপক শ্লোকবিশিষ্ট পদ : পুঁথির পৃষ্ঠা ২

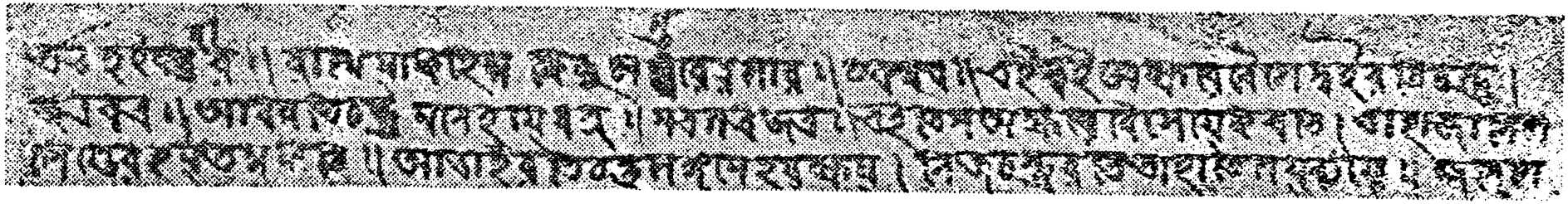

পুঁথির পৃষ্ঠা ৪

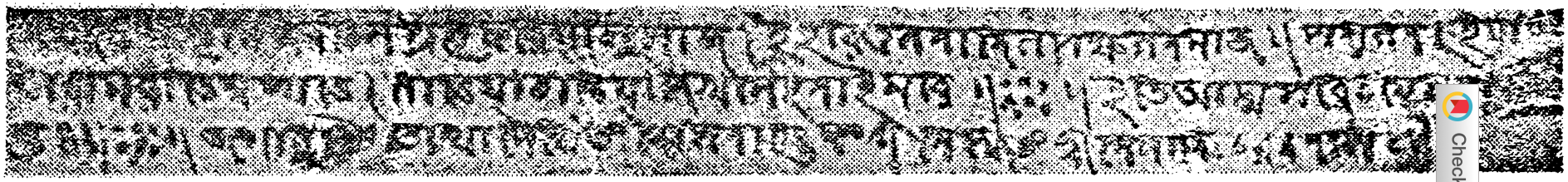

পুঁথির পৃষ্ঠা ১৪

Check for updates

আদ্য-পরিচয়

শেখ জাহেদ (প্রণীত ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দ)

মুহম্মদ এনামুল হক

ভূমিকা

পাণ্ডুলিপির আবিষ্কার

শেখ জাহেদ নামক এক অধ্যাত্মবাদী সাধক কর্তৃক খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে রচিত 'আদ্য-পরিচয়' একটি হিন্দু-মুসলিম চিন্তামিশ্রণসঞ্জাত তন্ত্রশাস্ত্রধর্মী বাংলা গ্রন্থ। এই সময়কার বাংলা-ভাষায় রচিত এই জাতীয় এই গ্রন্থটি একক না হইলেও, একান্তই বিশিষ্ট। মুসলিম আমলে বাংলাদেশে,—১৫০০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী বাংলাদেশ নহে,—যেই চিন্তাবিপ্লব ঘটে, তাহার একটা আংশিক চিত্র ইহাতে বিধৃত। এই দিক হইতে চিন্তা করিলে এই পুস্তকের মূল্য বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া, বাংলার অধ্যাত্মজগতে অপরিসীম।

বর্তমান সময় (১৯৭৯) হইতে প্রায় ষাট বছর আগে ইংরেজ রাজত্বের শেষের দিকে, অন্যান্য বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তকের একগাদা পাণ্ডুলিপির সহিত বক্ষ্যমাণ পুস্তকের একখানা পাণ্ডুলিপি ভারতের পশ্চিম-বঙ্গে অবস্থিত 'মালদহ'-জেলা হইতে পরলোকগত শরৎকুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া অধুনাতন বাংলাদেশস্থ রাজশাহী জেলার 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ও যাদুঘরের' পুঁথিশালায় সংরক্ষিত হইয়াছিল। সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইবার পর হইতে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ অবধি কেহ এই পুঁথির স্তূপটি নাড়াচাড়া করিয়াও দেখেন নাই। ফলে, লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থায় পাণ্ডুলিপিটি দীর্ঘকাল ধরিয়া উক্ত যাদুঘরেই পড়িয়া থাকে।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে যখন ভারত বিভক্ত হইয়া পাকিস্তান ও ভারত,—এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল, তখন সাবেক 'পূর্ববঙ্গ' নবীন পাকিস্তান-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'পূর্ব-পাকিস্তান' নামে চিহ্নিত ও অভিহিত হইল। ভারত-বিভাগকে উপলক্ষ করিয়া দেশে রাষ্ট্রিক, আর্থনীতিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বহু বিষয়ে দেশে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দিল। পৈতৃক ভিটাবাড়ি ছাড়িয়া লোক তাড়াহুড়া করিয়া এক দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যদেশে চলিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কাহারও প্রতি বড় একটা ফিরিয়াও তাকাইতেছিল না।

দেশ-বিভাগের সময় পর্যন্ত 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি ও যাদুঘর' প্রায় সম্পূর্ণ হিন্দু পরিচালিত প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করিতেছিল। কাজ তখন পর্যন্ত ভালই চলিতেছিল।

বলা বাহুল্য, দেশ বিভাগের পর দলে দলে হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি ও যাদুঘর' প্রায় দুই বৎসর যাবৎ অত্যন্ত অব্যবস্থিত অসহায় ও নিতান্ত অযত্নে পড়িয়া থাকে। এই সময় প্রতিষ্ঠানটির বহু মূল্যবান বই-পুস্তক ও জিনিস-পত্র চুরি যায় এবং অযত্নে বিনষ্ট হয়।

অতঃপর, ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথমার্ধের দিকে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার রাজশাহী সরকারী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মরহুম মীর জাহান সাহেবের স্কন্ধে অর্পিত হয়। তিনি স্থানীয় লোকনাথ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড্-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র মোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ মহোদয়ের সহায়তায় যাদুঘরের অবিবরিত পাণ্ডুলিপিগুলির একটি বিবরণী প্রস্তুত করাইতে গিয়া পূর্ব-সংগৃহীত স্তূপীকৃত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্য হইতে 'আদ্য-পরিচয়ের' পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেন। আমি তখন রাজশাহী কলেজে বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ। হিন্দুদের কাছ হইতে সংগৃহীত হিন্দু গ্রন্থকারের স্তূপীকৃত পাণ্ডুলিপির মধ্য হইতে হঠাৎ করিয়া মুসলিম গ্রন্থকার রচিত একখানা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাওয়ায়, অধ্যাপক মহোদয়ের বিশেষ দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি তৎপ্রতি আমার আশু-দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পাণ্ডুলিপিখানি নাড়াচাড়া করিয়া দেখা গেল, ইহা কোন মধ্যযুগীয় সাধারণ সাহিত্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নহে। অধিকন্তু, ইহার লেখা যতখানি প্রাচীন নহে, ততোধিক দুষ্পাঠ্য। ফলে, পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহার বিষয়বস্তু সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করা সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবপর হইল না।

প্রায় ১১½" ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৪½" ইঞ্চি প্রস্থ পুরু তুলট কাগজে পাণ্ডুলিপিটি অনুলিখিত হইয়াছিল। ইহাতে অনুলিখনের কোন সন-তারিখ পাওয়া যায় নাই। তথাপি, কাগজের প্রস্তুত-প্রণালী, আকৃতি, রঙ, সংরক্ষণ-ব্যবস্থা, আদ্যন্ত অক্ষত অবস্থায় পাণ্ডুলিপির উদ্ধার, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—সবকিছু মিলাইয়া বিচার করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, প্রায় দুই শত বৎসরের অনূর্ধ্ব কালে কোন সময়ে পাণ্ডুলিপিটি অনুলিখিত হইয়াছিল। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে পাণ্ডুলিপিটিকে পুরাতন বলিয়াই উল্লেখ করিতে হয়। অধিকন্তু, যে পাণ্ডুলিপিগুলির সহিত এই পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোন কোন পাণ্ডুলিপি ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন। দুই একটি পাণ্ডুলিপিতে নকলের তারিখও পাওয়া গিয়াছে: তাহার নিম্ন সীমা বাংলা ১২০৮ সাল। বলিয়া রাখা ভাল, ইহা 'আদ্য-পরিচয়' নকলের তারিখ নহে।

পুস্তকটির নাম ও অনুলেখক

আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ রচনাটির নাম সম্বন্ধেও নিঃসন্দিগ্ধ হইতে হইবে। নতুবা ইহাতে বিবৃত বিষয়-বস্তু অনুধাবনে অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে।

বক্ষ্যমাণ 'পরিচায়িকা'-র গোড়াতেই রচনাটিকে 'আদ্য-পরিচয়' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা আমার বা অন্য কাহারও বিচার-বিবেচনাপ্রসূত নাম নহে। এই পুস্তকের এই 'আদ্য-পরিচয়' নামটি পুস্তকটির অন্তে অর্থাৎ রচনা-শেষে অনুলেখক কর্তৃক এইভাবেই দেওয়া হইয়াছে :

"ইতি আদ্য পরিচয় সমাপ্ত।
জথা দৃষ্টং তোথা লিখিতং দোস নাস্তিকং।
লিখিতং শ্রী নেমাঞি চরন দাস।"

বলা বাহুল্য, 'আদ্য-পরিচয়' নামটি পাণ্ডুলিপির অনুলেখক 'শ্রী নেমাঞি চরন দাস' কর্তৃক প্রদত্ত নাম যে নহে, তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ খুঁজিয়া দেখিলেও, পুস্তকের এই নামটিকেই সমর্থন করিতে হয়। এখন তাহাই করা যাউক। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই দেখা যায়, এই বলিয়া লেখক তাঁহার বক্তব্য আরম্ভ করিয়াছেন :

সুনহ আদ্য কথা মন করি থির।
কেমতে উৎপত্তি হএ মনুষ্য শরীর।।

বলিয়া রাখা ভাল,—এই অধ্যায়ে মানুষের 'জন্মতত্ত্ব' বিবৃত হইয়াছে এবং এই জন্ম-তত্ত্বকেই 'আদ্য কথা' বলা হইয়াছে।

অতঃপর, চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই গ্রন্থকার এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য তুলিয়া ধরিয়াছেন নিঃসঙ্কোচে ও অবলীলাক্রমে :

সুনহ আদ্যের কথা করোঁ নিবেদন।
জেমতে হৈল আদমের সৃষ্টি উপার্জন।।

এইখানে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থকার কর্তৃক 'গর্ভের বিচার' বর্ণিত হইয়াছে।

লক্ষণীয় বিষয় হইল,—'আদ্য কথা' ও 'আদ্যের কথা' দুইভাবে উক্ত একই উক্তি। এবং ইহা ও পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ব্যবহৃত এই জাতীয় অন্যান্য উক্তির দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণোৎপত্তিতে মাতা, পিতা ও বিধাতা-পুরুষের নিকট হইতে মানুষ ভাবী-জীবনের বর্ধিতব্য অঙ্কুরগুলি রহস্যজনকভাবে লাভ করিয়া থাকে। গ্রন্থকার তাঁহার এই গ্রন্থে এই রহস্য-উদ্‌ঘাটনেই সচেষ্ট হইয়াছেন ; অর্থাৎ এই গ্রন্থে গ্রন্থকার এই রহস্যের 'পরিচয়' দিয়াছেন। সুতরাং, এই গ্রন্থের 'আদ্য পরিচয়' নাম নিরর্থক নহে।

'আদ্য পরিচয়ের' অনুলেখকের নাম যে 'শ্রী নেমাঞি চরন দাস' তাহা পুস্তকটির সমাপ্তিজ্ঞাপক প্রাগুক্ত উদ্ধৃতি হইতে জানিতে পারা যায়। তাঁহার নামের বিশুদ্ধ রূপ হইবে—'শ্রীনিমাই চরণ দাস'। অনুলেখকের হস্তাক্ষরে দন্ত্য-'ন' ও মূর্ধন্য-'ণ' প্রায় একরূপ। তাঁহার 'ণ'-ত্ব ও 'ষ'-ত্ব জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই জন্যই আমরা উদ্ধৃতিটিতে দন্ত্য-'ন' ব্যবহার করিয়াছি।

আলোচ্য পাণ্ডুলিপির অনুলেখক একজন অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কেননা, তিনি নিজের নামটিও শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারেন নাই। শুদ্ধরূপে লিখিত হইলে, তাঁহার নামের 'নেমাঞি' স্থলে 'নিমাই' এবং 'চরন' স্থলে যে 'চরণ' হইত, তাহা উপরেরই অনুচ্ছেদে দেখানো হইয়াছে। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) মাতৃদত্ত নাম ছিল 'নিমাই' —'নেমাঞি' নহে। 'নিমাই' একটি চমৎকার তদ্ভব শব্দ। ইহা সংস্কৃত 'নিম্ব' শব্দ হইতে এইভাবে উদ্ভূত :

সং. নিম্ব > নিম্ম > নীম > নিম + (আদরে) আই (প্রত্যয়) = 'নিমাই' ; শব্দটির অন্ত্য-'ই' পূর্ববর্তী 'ন' এবং 'ম'-এর প্রভাবে 'ঞি' ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। চৈতন্যদেব জনসাধারণের মধ্যে সচরাচর এই নামেই পরিচিত ছিলেন। মুর্শিদাবাদ ও মালদহ অঞ্চলের এই 'নিমাই' শব্দটি মৌখিকভাবে 'নেমাই'রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। 'আদ্য-পরিচয়ের'

অনুলেখক 'মালদহ' অঞ্চলের লোক হইবেন। কেননা, তাঁহার পাণ্ডুলিপিটি 'মালদহ' হইতে আরও একগাদা পাণ্ডুলিপির সহিত সংগৃহীত হইয়াছিল। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাঁহার নামের লিখিত রূপটিও মালদহের আঞ্চলিকতা-দোষে দুষ্ট। সেই জন্য 'নিমাই' শব্দ 'নেমাঞি' রূপে লিখিত হইয়া থাকিবে।

পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত বহু শব্দের বানানে আঞ্চলিক রূপ অর্থাৎ 'মালদহ'-অঞ্চলের রূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহাও 'শ্রী নেমাই চরন দাসের' আর একটা কীর্তি। তিনি যখন সুপ্রসিদ্ধ সর্বনাম 'যথা' শব্দের সম্বন্ধজ্ঞাপক শব্দ 'তথা'-র স্থলে বর্ণবিন্যাসে 'তোথা'; 'দোষ'-শব্দের স্থলে বর্ণবিন্যাসে 'দোস'; 'শুন' শব্দের স্থলে বর্ণবিন্যাসে 'সুন'; 'চিত্ত' শব্দের স্থলে বর্ণবিন্যাসে 'চিত্তি'; 'আপন' শব্দের স্থলে বর্ণবিন্যাসে 'আপুন' ইত্যাদি, ইত্যাদি লেখেন, তখন তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির উপর যতটা আস্থা রাখা যায় না, তাঁহার আঞ্চলিকতার উপর ততোধিক বিশ্বাস রাখিতে হয়। বাধ্য হইয়াই আমরা পাণ্ডুলিপিটির সম্পাদনে এই জাতীয় আঞ্চলিক ধ্বনিপ্রভাবিত বর্ণবিন্যাস যথাসাধ্য অর্থাৎ কিনা যথা-প্রয়োজন পরিত্যাগ করিয়াছি।

পাণ্ডুলিপিকার 'শ্রী নেমাঞি চরন দাস' যতই স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি হউন না কেন, তাঁহার যে পণ্ডিতম্মন্যতার অহমিকা ছিল, তাহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। কেননা, তিনি পাণ্ডুলিপির 'মঙ্গলাচরণে' (এই মঙ্গলাচরণ অনুলিপিকারের 'আদর্শ-পুঁথির' মঙ্গলাচরণ যে নয়, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না) এবং 'পুষ্পিকায়' বিকৃত-সংস্কৃতভাষায় রচিত যে-দুইটি ঘোষণা দিয়াছেন, তাহাই আমার উক্ত অনুমানের প্রমাণ। ঘোষণা দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

মঙ্গলাচরণ

শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ। শ্রী ইলাহি আলামিন। শ্রী গণেশায় নমঃ। শ্রী গুরুর চরণে নমঃ। শ্রী শ্রী মাতাপিতার চরণাভ্যাম॥ দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু নমঃ।

পুষ্পিকা

ইতি আদ্য পরিচয় সমাপ্ত।
জথা দৃষ্টং তোথা লিখিতং দোস নাস্তিকং।
লিখিতং শ্রী নেমাঞি চরন দাস।

পণ্ডিতম্মন্যতার অহমিকা ব্যতীত অন্য কোন কারণে এমন অদ্ভুত ধরনের সংস্কৃতে স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করার সার্থকতা কি? এইরূপ অবস্থা-বৈগুণ্যে নিমাই চরণ দাসের অনুলিখিত পাঠকে (বিশেষতঃ যেই সমস্ত স্থানে ভাষায় অর্থের সামঞ্জস্য পূর্বাপর সংরক্ষিত হয় নাই) সর্বত্র নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা যায় না। অতএব, অর্থসংগতি রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়া আমরা স্থানে স্থানে (সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প) মূলের সহিত নিকটতম যোগ রক্ষা করিয়া পাঠ শুদ্ধ করিয়া দিয়াছি, যেমন—

মূলে—অনাদ্য ধম্মের জথ বএস রতন।
পরিবর্তিত পাঠ—অনাদ্য ধম্মের জথ বৈসএ রতন।

অথবা

মূলে—　　জদি না মেলে সুখ
কেহো নাঞি পাএ সুখ
বচন না লইলে নহে কিছু ॥

পরিবর্তিত পাঠ—　　জদি না মেলএ সুখ
কেহো নাঞি পাএ সুখ
বচন না হৈলে নহে কিছু ॥

এতদ্ব্যতীত নিমাই চরণ দাসের অনুলিখিত পাণ্ডুলিপিতে মধ্যে মধ্যে 'ছাড়'-ও রহিয়াছে। ইহা স্থানে স্থানে মারাত্মক। নিমাই চরণের 'আদর্শ'-পুঁথির পাণ্ডুলিপির প্রাচীনত্ব ও তাঁহার ব্যক্তিগত অনবধানতা,—এই দুই কারণেই প্রস্তুত-পাণ্ডুলিপিতে 'ছাড়ের' আবির্ভাব ঘটিয়া থাকিবে। যেই কারণেই হউক, বক্ষ্যমাণ পাণ্ডুলিপিটির পাঠ সর্বত্র সমভাবে বোধগম্য নহে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত ঐ সমস্ত দুর্বোধ্য অংশকে সুবোধ্য করা সম্ভবপর নহে। তথাপি আমার সম্পাদিত পাঠে আমি ঐ সমস্ত লুপ্ত অংশকে আমার সীমিত জ্ঞান প্রয়োগে বোধগম্য করিয়া তুলিবার জন্য শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দিয়াছি।

এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তাহা হইল,—সেক জাহেদ (শৈখ জাহিদ) রচিত 'আদ্য পরিচয়' শ্রী নেমাঞি চরন দাস নকল করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মুসলমান কবির পুঁথি হিন্দু কর্তৃক অনুলিখিত হইয়াছিল। ইহা সচরাচর আশা করা না গেলেও, এমন ঘটনা মধ্যযুগে বিরল ছিল না। বর্তমানে বই-পুস্তক ছাপাইবার জন্য মুদ্রণ-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগে পুস্তক যখন নকল করিয়াই পড়িতে হইত, তখন এই কাজটি আঞ্জাম দেওয়ার জন্য এক শ্রেণীর লোক পুস্তক নকল করার ব্যবসা চালাইত। এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে যাহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা ছিলেন 'কায়েত' বা কায়স্থ; আর যাঁহারা মুসলমান ছিলেন, তাঁহাদিগকে বলা হইত 'কাতেব' বা 'কাতিব'। এই কাজ করিয়া অনেকে জীবিকানির্বাহ করিতেন।

যখনকার কথা বলা হইতেছে, তখনকার দিনে মুসলমান কবি-রচিত পুঁথিও হিন্দু নকল করিতেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের 'কালিদাস নন্দী' মুসলমান কবির বহু পুঁথি নকল করিয়া অপরের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, জীবিকানির্বাহের জন্যই তিনি এই কাজ করিতেন। কিন্তু, 'নেমাই চরণ দাস' জীবিকানির্বাহের উপায়রূপে 'সেক জাহেদের' পুঁথি নকল করিয়াছিলেন,—এমন কোন প্রমাণ নাই। আমার ধারণা,—তিনি নিজে ব্যবহার করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন, এমন একটি উদ্দেশ্য লইয়া এই পুস্তক নকল করিয়া লইয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপির 'মঙ্গলাচরণই' তাহার একটি প্রমাণ বলিয়া মনে করিবার পক্ষে যুক্তি আছে। বলিতে কি, এই পুঁথির পাণ্ডুলিপিতে যেই তত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে, তাহা হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষে এক শ্রেণীর মানুষের সকলের নিকট উপযোগী বলিয়া তখনকার দিনে অনেকেই বিশ্বাস করিতেন। এই তত্ত্বকে অতি সংক্ষেপে যোগ-তন্ত্র-সূফীবাদ-সংমিশ্রিত একটি অধ্যাত্মমত বলা চলে। বাংলাদেশে (আধুনিক 'বাংলাদেশ' নহে) ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের মধ্যে এই মত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

পুস্তক রচনার তারিখ

মধ্যযুগের অধিকাংশ পুস্তকে রচনার তারিখ পাওয়া যায় না। মনে হয়, এই সময়ের পুস্তক-রচয়িতৃগণ ইতিহাস, তথা সময়সচেতন ছিলেন না। ফলে, এই সময়কার

কোন পুস্তকে রচনার তারিখ পাওয়া যাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। বর্তমান পুস্তক-সম্পাদনে হাত দিয়া আমরা সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছি। এই পুস্তকের ভূমিকায় মধ্যযুগীয় রীতিতে গ্রন্থকার তাঁহার রচনার যেই তারিখটি একটি হেমালিকার আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই পুস্তকটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ রাখে নাই। তারিখ-জ্ঞাপক হেমালিকাটি এইরূপ :

ব্রহ্মার আনন জত রাবণের করে।
গুনিলে জত হএ সহস্র উপরে।।
এত সাকের মাঝে করিল প্রচারে
পয়ার প্রবন্ধে কহি আঁতুমা বিচারে।।
জাহেদ কহে চিত্তি করি আছোঁ সার।
সুহৃদ চরণ বিনু গতি নাঞি আর।।

ইহার উদ্‌ঘাটন

ব্রহ্মার অপর নাম 'চতুর্মুখ' অর্থাৎ ব্রহ্মা, চারিমুখবিশিষ্ট দেবতা। সুতরাং, **ব্রহ্মার আনন** কথার দ্বারা অঙ্কপাতে **চারি** সংখ্যা বুঝাইতেছে। আবার রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত লঙ্কার রাজা রাবণের অপর নাম **দশানন** অর্থাৎ দশমুণ্ডধারী দৈত্য এবং এই দৈত্যের প্রতি মুণ্ডের জন্য দুইখানা করিয়া মোট কুড়িটি হাত কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং, **রাবণের কর** কথায় 'কুড়ি'-সংখ্যা বুঝাইতেছে। এই কারণে, হেমালিকাটির প্রথম চরণের দ্বারা বিজ্ঞাপিত সংখ্যা দুইটি বলার ক্রম অনুসারে পর পর বসাইয়া গণিলে যেই সংখ্যা দাঁড়ায়, তাহা হইতেছে ৪২০ চারিশত কুড়ি। পরবর্তী চরণে এই সংখ্যার (৪২০) উপর আরও এক হাজার (১০০০) যোগ করিয়া পুস্তক রচনার তারিখ লাভের শকাব্দটি পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হইতে বলা হইয়াছে। তাহা করিলে, অর্থাৎ ৪২০ সংখ্যার সহিত ১০০০ যোগ করিলে ১৪২০ সংখ্যা পাওয়া যায়। ইহা শকাব্দ এবং পুস্তক 'প্রচারের' অর্থাৎ 'রচনার' বৎসর। ইহার সহিত {(১৪২০)+৭৮} আটাত্তর যোগ দিয়া খ্রীস্টাব্দের সংখ্যা পাওয়া যাইবে এবং তাহা হইবে ১৪৯৮। অতএব, 'আদ্য-পরিচয়' ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়।

এখানে কোন মোটা-বুদ্ধি-লোক প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে, 'প্রচার' শব্দের অর্থ 'রচনা' হইতে পারে কি? সোজা উত্তর হইল,—'না, হয় না'। তবে, বলিতে হইবে, এইখানে এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার কারণ নিম্নে বিবৃত হইল :

তত্ত্বভিত্তিক বিচারেই এই অর্থ (প্রচার=রচনা) গ্রহণ করা হইয়াছে। 'আদ্য-পরিচয়ে' যেই 'গুপ্ততত্ত্ব' ব্যাখ্যাত তথা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, অথবা হইবার চেষ্টা চলিয়াছে, গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ের (অষ্টম অধ্যায়ের) শেষে তৎপ্রতি একটি ইঙ্গিত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার নাম 'আউটি-ভেদ'-বিচার অর্থাৎ 'শারীর-রহস্য'-বিচার। বলিয়া দেওয়া উচিত যে, 'আউট' বা 'আউটি' শব্দটি সংস্কৃত 'অর্ধচতুর্থ' (যাহার অর্থ 'সাড়ে তিন') শব্দ হইতে উৎপন্ন 'তদ্ভব'-শব্দ। ইহার বিবর্তন ধারা এইরূপ ছিল বলিয়া মনে করিবার পক্ষে ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি আছে—

সং. অর্ধচতুর্থ (=চার হইতে অর্ধেক উন বা কম)>
অড্‌ঢউট্‌ঠ>আঢউঠ>আহউঠ>আহুঠ>
আহুট>আউট+ই=আউটি. (সাড়ে তিন)।

শব্দটি বিশেষ প্রাচীনত্বদ্যোতক : শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে 'সাড়ে তিন' অর্থে 'আছঠ হাথ' কথাটি এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজেও ঐ একই অর্থে 'আউট হাত প্রমাণ আমার কলেবর' চরণটি দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের দেহ তাহার নিজের হাতের মাপে সাড়ে তিন হাত বলিয়া, 'আউট' শব্দকে 'আউটি'-রূপে দেহের পারিভাষিক শব্দরূপে এই পুস্তকে গৃহীত হইয়া থাকিবে। অতএব, দেখা যাইতেছে, 'আদ্য-পরিচয়ে' যেই 'আউটি-ভেদ' বা মানব-শরীরের মধ্যে অদৃশ্য ও দুর্বোধ্য রহস্য (=ভেদ) বিদ্যমান, তাহাই উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস চলিয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষায় তাহা জানিয়া রাখা ভাল :

সেক জাহেদে কহে করিআ বিচারে।
ইহার অধিক গোসাঞি করিবারে পারে।।
সংসার রচিল গোসাঞি নানান প্রকার।
কত জে রচিল হেতু না বুঝিলুঁ তার।।
প্রভুর মায়াএ কেবা বুঝিবারে পারে।
মরাকে জিয়াএ প্রভু জিয়ন্তকে মারে।।

এখন আর সন্দেহ থাকা উচিত নহে যে, মানুষের রহস্যময় জন্মমৃত্যু-তত্ত্বই বক্ষ্যমাণ পুস্তকে বিবৃত ও প্রচারিত হইয়াছে। এতৎসত্ত্বেও, তত্ত্বটির যাবতীয় রহস্য যে উন্মোচিত হয় নাই, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার সচেতন। এই তত্ত্বের পূর্ণ উন্মোচন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ, ইহা একটি 'গুরুপরম্পরা বিদ্যা' বলিয়া 'মন্ত্রগুপ্তি-নীতি' কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয় এবং কানে-কানে বংশ পরম্পরায় চলে। সূফীদের মতে এই গুপ্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ব্যাপারটি 'সিনা-ব-সিনা' অর্থাৎ বুকে-বুকে চলিতে থাকে,—মুখে মুখে বা লিখিতভাবে সচরাচর প্রচারিত হয় না। কিন্তু, বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা হইয়াছে; অবশ্য তাহাও গুরুর উপদেশ অনুসারেই করা হইয়াছে। যেই সমস্ত কথার মূল জানা আছে এবং যেই সমস্ত কথার মূল জানা নাই,—তাহার সমস্তই লেখককে গুরু কানে কানে কহিয়া দিয়াছেন। ফলে, তাঁহার মধ্যে যেই জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে, তিনি তাহাই গুরুর আদেশে লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন :

কিঞ্চিত কহিমু তাহা গুরুর উপদেশ।
তাহার প্রসাদে মুঞি জানিলুঁ বিসেস।।
আদ্য অনাদ্য গুরু কহিল শ্রবণে।
সেই হইতে মোর জনমিল জ্ঞানে।।
কহিল সকল কথা হৃদয়ে উতারি।
কিঞ্চিত কহিমু সেই কথা অনুসারি।।
গৌরচন্দ্রিকা : 'আদ্য-পরিচয়'

[টীকা :—হৃদয়ে উতারি—হৃদয় হইতে বাহির করিয়া দিয়া। 'হৃদয়ে' অপাদান কারকে (সং. হৃদয়াৎ) ব্যবহৃত। অনুসারি—অনুসরণ করিয়া অর্থে নহে। ইহা সংস্কৃত 'অনুস্মার'—অনু(পশ্চাৎ)+স্মার (স্মরণ) এই বিশেষ্য পদের নাম ধাতুতে 'অনুস্মারি' অর্থাৎ শিখিয়া লইবার পরে তাহা স্মরণ করিয়া অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।]

গ্রন্থকার-পরিচিতি

'আদ্য-পরিচয়' গ্রন্থটি যেমন এতদিন আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল, ইহার রচয়িতাও তেমন ছিল নিতান্ত অপরিচিত। সুতরাং, এই ব্যাপারে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ নাই বলিলেই চলে। পুস্তকে যে-কয়টি ভণিতা পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ :

১. জাহেদ কহে চিত্তি করি আছোঁ সার।
সুহৃদ চরণ বিনু গতি নাঞি আর॥
(গৌরচন্দ্রিকা)

২. সেবক জাহেদ কএ সুন গুরু মহাশএ
শতে শতে প্রণতি আমার।
(প্রথম অধ্যায়)

৩. জাহেদ কহএ মাতাপিতা দেবীদেবা।
তার কর্ম ভাল সে করিতে পাএ সেবা॥
(দ্বিতীয় অধ্যায়)

৪. সেক জাহেদ কএ জানিহ জে সুনিশ্চএ
এই সব লিখনের বশ
(তৃতীয় অধ্যায়)

৫. সেক জাহেদ কহে গর্ভের বিচার।
শরীরেত দশ রত্ন দেয় করতার॥
(চতুর্থ অধ্যায়)

৬. জাহেদ কহএ বাণী এত দিনে ভালে জানি
তাহা বিনু আর কেহ নাঞি।
(পঞ্চম অধ্যায়)

৭. পিণ্ডে অনুমান করি জাহেদে জে কএ।
দুই চক্ষু মুদিলে কেহো কারো নএ॥
(ষষ্ঠ অধ্যায়)

৮. সেক জাহেদ কএ জানিলুঁ জে সুনিশ্চএ
ঘট কৈল গোসাঞি ভাণ্ডার।
(সপ্তম অধ্যায়)

৯. সেক জাহেদ কহে করিয়া বিচার।
ইহার অধিক গোসাঞি পারে করিবার॥
(অষ্টম অধ্যায়)

উক্ত ভণিতাগুলি হইতে এই কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, গ্রন্থকারের পূর্ণ নাম সেক জাহেদ। বলা ভাল, ইহা পাণ্ডুলিপির মূল বানানে উদ্ধৃত হইল; আধুনিক শুদ্ধ বানানে "শেখ (শৈখ) জাহিদ (شيخ زاهد)" রূপে লেখাই উচিত। তাঁহার এক 'গুরু' ছিল; নিশ্চয় 'শিক্ষা গুরু' নহে; বরং 'দীক্ষা-গুরু'। তাঁহার কাছ হইতে তিনি 'গুপ্ত-জ্ঞান' লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 'সেবক'-রূপে এই গুরুকে 'প্রণাম' করিতেন। গুরু তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া গুরুর 'গুপ্ত-জ্ঞান' লিখিয়া ফেলিয়া জনসাধারণে প্রচার করিতে আদেশ অর্থাৎ 'উপদেশ' দিলেই ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে 'আদ্য-পরিচয়' নামে তিনি তাহা প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন।

অন্য কোন বাস্তব প্রমাণের অভাবে শেখ জাহিদকে মালদহ জেলার (যাহা বর্তমানে ভারতের 'পশ্চিম-বঙ্গে' অবস্থিত) অধিবাসী বলিয়া অনুমান করা সহজ। কারণ, তাঁহার 'আদ্য-পরিচয়ের' পাণ্ডুলিপি মালদহ জেলা হইতে সংগৃহীত ও 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি' পরিচালিত 'রাজশাহী-যাদুঘরে' সংরক্ষিত ছিল। লেখার ছাঁদ, কাগজের আকার, বানাইবার সামগ্রী, ব্যবহৃত কালি ও কালির উপাদান,—সব কিছু মিলাইয়া একত্রে বিচার করিলে মালদহ হইতে সংগৃহীত এতৎসংশ্লিষ্ট পাণ্ডুলিপিগুলির সহিত ইহার বড় একটা প্রভেদ দেখা যায় না। সুতরাং, 'আদ্য-পরিচয়ের' পাণ্ডুলিপিটি যে মালদহে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য, অন্য কোন স্থানের পাণ্ডুলিপি মালদহে লইয়া আসিয়া এইস্থানেই অনুলিখিত হইয়াছিল কি না, সেই কথা জোর করিয়া বলিতে পারা না গেলেও, বাংলার অন্য কোন স্থান হইতে এই পর্যন্ত যখন শেখ জাহিদের এই পুঁথির কোন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইল না, তখন পুঁথি ও পুঁথির রচয়িতা উভয়কেই আমি মালদহের বলিয়া মনে করি। আমার এই ধারণা একান্ত অযৌক্তিক ও মনগড়া নহে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে আমার এই ধারণার সারবত্তা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে:

বাংলাদেশ মুস্‌লিম্ অধিকারভুক্ত হওয়ার (১২০২ খ্রীস্টাব্দ) পর হইতেই বর্তমান 'মালদহ' জেলার লখ্‌নৌতী (লক্ষ্মণাবতী) স্বল্পকালের জন্য এবং পাণ্ডুয়া ও গৌড় দীর্ঘ-কালের জন্য মুসলিম অধিকৃত বঙ্গের রাজধানী ছিল। ফলে, দেশের রাষ্ট্রীয় তৎপরতার সহিত বিদ্যা, ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্ররূপে শহরগুলি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে থাকে। দেখা যায়—

সুলতান 'আলী মর্দানের রাজত্বকালে (১২১০-১২১৩) লখনৌতীতে রুকনু-'দ্-দীন্ সমর্‌কন্দী নামে সর্বজনমান্য এক পণ্ডিত কাজীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন আসামের কামরূপ নগরীতে অবস্থিত কামাখ্যাদেবীর ভারতবিখ্যাত মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া, যোগ, তন্ত্র, মন্ত্র, মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি বিদ্যাচর্চা ও সাধনপদ্ধতি অনুশীলিত হইত। এই কারণে এই নগরীতে অনেক ভারতীয় পণ্ডিত, দার্শনিক ও সন্ন্যাসী বাস করিতেন।

কামরূপের ভারতীয় পণ্ডিতেরা যখন জানিলেন যে, বাংলাদেশ মুসলমান কর্তৃক বিজিত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের মধ্য হইতে 'ভোজর ব্রাহ্মণ' নামে এক যোগী মুসলমান পণ্ডিতদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কামরূপ হইতে লখ্‌নৌতীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাজী রুকনু-'দ্-দীন্ সমর্‌কন্দীর (মৃ. ১২১৮ খ্রী.) সহিত মিলিত হইয়া অধ্যাত্ম বিষয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হন ও পরাজিত হন। অতঃপর, যোগী ইসলাম

ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম-শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া ইসলামী ব্যবস্থা (ফতোয়া) প্রদানের যোগ্যতা লাভ করেন।

এই ধর্মান্তরিত যোগী ও 'ফকীহ' (মুসলিম ধর্মীয় ব্যবস্থাপক) কাজী রুকনু-দ্-দীন সমরকন্দীকে 'অমৃতকুণ্ড' নামে একখানা যোগ-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ উপহার দেন। কাজী পুস্তকটির মর্ম অবগত হইয়া মুগ্ধ হন এবং প্রথমে হিন্দী ভাষা অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা হইতে ফার্‌সীতে এবং পরে ফার্‌সী হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। ক্রমে ক্রমে 'অমৃত-কুণ্ডের' এই ফার্‌সী ও আরবী অনুবাদ বাংলা, ভারত ও মুসলিম জগতের নানা স্থানে প্রচারিত হয়। 'অমৃত-কুণ্ডের' ফার্‌সী নাম 'বাহরুল হায়াত্' ও আরবী নাম 'হৌজু-'ল্-হায়াত্'। ইহা যোগ ও তন্ত্রবিষয়ক পুস্তক।

'অমৃত-কুণ্ডের' আরবী সংস্করণের অধ্যায়সূচী এইরূপ :

ভূমিকা

১. ক্ষুদ্রতম বিশ্বের বিবরণ
২. ক্ষুদ্রতম বিশ্বের অন্তর্গত বস্তুসমূহের লক্ষণ ও প্রভাব বর্ণনা
৩. হৃদয়ের (heart) প্রকৃতি ও তাহার রহস্য
৪. যোগাভ্যাসের তাৎপর্য
৫. প্রাণায়ামের প্রকৃতি ও প্রাণের অবস্থান
৬. বীর্যরক্ষার তাৎপর্য
৭. যোগসাধন-পদ্ধতি
৮. মৃত্যুর লক্ষণ ও তাহার প্রতিরোধ প্রণালী
৯. অশরীরী জীবসকলকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি
১০. উপসংহার।

(দ্রষ্টব্য : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ৬৯তম বর্ষ, সংখ্যা ১-৪, ১৩৬৯ সাল, পৃষ্ঠা ১-২০)

কাজী রুকনু-'দ্-দীন্ সমরকন্দী (মৃ. ১২১৮ খ্রী.) ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লক্ষ্মণাবতীতে বসিয়া যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ 'অমৃত-কুণ্ডের' আরবী অনুবাদের মধ্যস্থতায় এই দেশের মুসলমানদিগের জন্য ভারতীয় বিদ্যার যেই অভিনব দ্বার উন্মুক্ত করিলেন, তাহার প্রায়োগিক ও তত্ত্বীয় ধারা পরবর্তী কালে অবারিত স্রোতে ক্রমশঃ গৌড় ও পাণ্ডুয়ার সূফী কেন্দ্র হইতে দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বলিতে বাধা নাই, মালদহের গৌড় ও পাণ্ডুয়াই মুসলিম ও বঙ্গীয়, তথা ভারতীয় চিন্তাধারার একটি আদি মিলন-ক্ষেত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কালক্রমে এই আদি-কেন্দ্রটি সম্প্রসারিত হইয়া পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে একান্তই বিশিষ্ট হইয়া উঠে। কালন্দরীয়া, মাদারীয়া, শত্তারীয়া প্রভৃতি দরবেশদের কর্মতৎপরতায় পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশ (প্রাক্তন) মাতিয়া উঠে। [*A History of Sufi-ism in Bengal* : Muhammad Enamul Haq, (1975) Asiatic Society of Bangladesh, Dacca, PP. 154-182.] মনে রাখিতে হইবে যে, দরবেশদের এই সম্প্রদায়গুলিই যোগ, তন্ত্র, মন্ত্র, তুক্‌তাক্ প্রভৃতি ভারতীয় আর্যানার্য বিদ্যার প্রধান ভক্ত ছিলেন। 'যোগ কালন্দর', 'মাদারী গান', 'ফকীর বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের আবিষ্কারে বঙ্গদেশ (পূর্ববঙ্গ) ইহার আপন বৈশিষ্ট্য বহুপূর্বে তুলিয়া ধরিয়াছে। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ এতদিন যেন এই ব্যাপারে

নীরব ছিল ; 'মালদহ' হইতে অর্থাৎ গৌড়-পাণ্ডুয়া হইতে 'শেখ জাহেদ' কৃত 'আদ্য-পরিচয়' আবিষ্কৃত হওয়ায়, বঙ্গের এই অঞ্চলের সাক্ষ্যও মিলিয়া গেল। কেননা, এই পুস্তকের বিষয়-বস্তুর সহিত এই জাতীয় অন্যান্য পুস্তকের বিষয়-বস্তুর কোন মৌলিক তফাৎ নাই। ইত্যাকার ও এবংবিধ প্রকৃতির নানা কারণে 'আদ্য-পরিচয়ে'র গ্রন্থকার শেখ জাহেদকে মালদহ জেলার গৌড় ও পাণ্ডুয়ার লোক বলিয়া অনুমান করা সহজ। তিনি একজন সাধক ছিলেন ; তাঁহার 'গুরু' ছিল এবং এই গুরুর উপদেশেই তিনি 'আদ্য-পরিচয়' রচনা করিয়াছিলেন। জাহেদ 'শেখ'-উপাধিধারী সাধক-বংশের লোক। এই কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। এবং তিনি যে ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে জীবিত থাকিয়া 'আদ্য-পরিচয়' রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও স্বীকার করিতে হয়।

খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া শহরে আমরা 'শেখ'-উপাধিধারী এক ঐতিহাসিক সাধক-পরিবারের সন্ধান লাভ করি। [*The History of Bengal*, Volume II, Edited by Sir J. N. Sarkar (1948), PP. 123-125.] পরিবারটির ইতিহাস এইরূপ :

শেখ্-'অলাউ-'ল্-হক্ (মৃত্যু-১৩৯৮ খ্রী.)
|
শেখ্ নূরু'দ্-দীন্ কুৎব্-ই-'আলম্ (মৃত্যু-১৪৪৭ খ্রী. অথবা ১৪১৫ খ্রী.)
|
শেখ্ আন্ওয়ার (হত্যা-১৪১৮ খ্রী.)
|
শেখ্ জাহিদ (জীবিত-১৪৯৮ খ্রী.)

চারি পুরুষে এক শত বৎসর হয় ;—ইহা একটি সর্বজন স্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্য। এই তুলাদণ্ডে মাপিলেও 'আদ্য-পরিচয়'-রচয়িতা শেখ জাহেদ এবং পাণ্ডুয়ার শেখ-পরিবারভুক্ত শেখ জাহিদ অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। শুধু নামের অভিন্নতা দেখিয়া দুই ব্যক্তিকে এক জন বলিয়া মনে করা হইতেছে এমন চিন্তা করা ভুল হইবে। দুই জনকে অভিন্ন মনে করার আরও পরোক্ষ কারণ বর্তমান এবং তাহা হইল উভয়ের আবির্ভাব কালের অভিন্নতা ; অধিকন্তু, কালিক চিন্তা ভাবনা ও তাহার প্রচার-প্রচেষ্টার অভিন্নতা।

ইসলাম ও বঙ্গীয়, তথা ভারতীয়, চিন্তাধারার সংমিশ্রণের ইতিহাসে,—দারা শিকোর (হত্যা ১৬৫৯ খ্রী.) ভাষায় 'মজম'উ-ল-বহরৈন্' বা 'দ্বিসমুদ্র-সঙ্গম' সৃষ্টি হওয়ার সময়ে,—খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী অত্যন্ত বিশিষ্ট। এই সময়ে কবীর (১৩৯৮-১৪৪৮), নানক (১৪৬৯-১৫৩৯), দাদু (কবীরের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক) ও চৈতন্যের (১৪৮৪-১৫৩৩) ন্যায় চিন্তাবীর, ভাববাদী ও কর্মবীরগণের প্রচার-তৎপরতায় বাংলাদেশসহ উত্তর-ভারতের সর্বত্র ভরিয়া উঠিয়াছিল। গৌড়ের রামকেলিতে এই সময় চৈতন্য-মতবাদ প্রচারের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও সেই স্থানে চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন-সংরক্ষিত একটি বৈষ্ণব-মন্দির রহিয়াছে এবং এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে একটি বিরাট মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলার নাম 'রামকেলির মেলা'। এই মেলায় এখনও প্রচুর বাউল, নেড়া-নেড়ী ও ফকীরের সমাগম হয়। শেখ জাহেদের 'আদ্য-পরিচয়' পুস্তকে সূফী, যোগ, তন্ত্র প্রভৃতি তত্ত্বের একত্র সমাবেশে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অধ্যাত্মবাদী বৈশিষ্ট্যটি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এবংবিধ নানা কারণে অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা 'আদ্য-পরিচয়ের' শেখ জাহেদকে পাণ্ডুয়ার 'শেখ-পরিবারের শেখ জাহিদ হইতে অভিন্ন মনে করি।

পুস্তকের বিষয়-বস্তু

প্রভু-নিরঞ্জন কোন্ কারণে এবং কি কি উপাদানে আদি-মানব 'আদম' সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞান মানুষের কাছে চিরন্তন রহস্যরূপে আজও বিদ্যমান। ইহা শিক্ষাসাপেক্ষ বিদ্যা নহে, বরং একটি গুরুমুখী জ্ঞান। তাই, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ইহার ধারা 'কান হইতে কানে'—সূফীদের কথায় 'সীনা-ব-সীনা'—ফল্গু-ধারার ন্যায় প্রবহমাণ। যেই পুস্তকে 'আদম'-সৃষ্টির আদি-রহস্য শেখ জাহেদ গুরুর অনুমতি লইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার নাম 'আদ্য-পরিচয়' অর্থাৎ মানব-সৃষ্টির আদি-বিবরণ-সম্বলিত গ্রন্থ। ইহাতে মুসলিম সূফী-চিন্তা এবং হিন্দুর যোগ ও তন্ত্র-চিন্তা হাত ধরাধরি করিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। বাংলার নাথ-সিদ্ধাদের গুরু গোরক্ষনাথ, মীননাথ <মৎস্যেন্দ্রনাথ> মছলন্দ পীর প্রভৃতির চিন্তাধারার প্রভাবও ইহাতে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে বর্তমান রহিয়াছে। তাই বলিয়া ইহাকে কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের অর্থাৎ হিন্দু, মুসলিম্ কি নাথ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। কেননা, ইহাতে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও বাংলার আদিম অধিবাসীর চিন্তা সংমিশ্রিত।

প্রধানতঃ এই কারণেই পুস্তকটির বিষয়-বস্তুর বর্ণনা খুবই কঠিন,—একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, মানুষের জন্ম, জীবন ও মৃত্যু-রহস্যকে কেন্দ্র করিয়া পুস্তকটিতে যেই নিগূঢ় তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, গুরুপরিচালিত অনুশীলন ব্যতিরেকে তাহার উপলব্ধি এবং বিনা উপলব্ধিতে তাহার ব্যাখ্যা সত্যই অসম্ভব। এতৎসত্ত্বেও, শেখ জাহেদ তাঁহার 'আদ্য-পরিচয়ে' যেমন করিয়াছেন, আমরাও নিম্নে তেমনভাবে একটা আভাসদীপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি :

গৌর-চন্দ্রিকা

যোগতন্ত্র, গর্ভতন্ত্র, দেহতত্ত্ব, সিদ্ধাই প্রভৃতি অগণিত অব্যক্ত রহস্য গুরুর আদেশে ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায় লইয়া গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তক 'আদ্য-পরিচয়' রচনার তারিখটি যে ১৪২০ শকাব্দ (১৪৯৮ খ্রী.) তাহা একটি হেমালিকায় বলিয়া দিয়া ভূমিকাটি শেষ করিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়—সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা : যখন একমাত্র প্রভু নিরঞ্জন ব্যতীত আর কিছু ছিল না, তখন তিনি নিজে নিজেই আপন মূর্তি ধারণ করিলেন। অতঃপর এক এক হুঙ্কারে এক এক করিয়া জীবজন্তু, দেবদেবী, তরুলতা প্রভৃতি সমস্তই সৃষ্টি করিলেন। কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হইল না। এইবার তিনি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তাহাকে রাজা বানাইয়া জীবজন্তুর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে দিতে মনস্থ করিলেন। তাহা হইলে সে জগতের সমস্ত জঞ্জাল ত্যাগ করিয়া স্রষ্টাকেই পূজা করিবে।

করিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই থাকে; দ্বিতীয় মাসে তাহা দুধের মতো রঙ্ ধারণ করে; তৃতীয় মাসে তাহা চতুর্দিকে মায়ের রক্তে পরিবেষ্টিত হইয়া ঘনীভূত হইতে থাকে; চতুর্থ মাসে তাহা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার প্রাপ্ত হইতে থাকে; পঞ্চম মাসে ভ্রূণের মধ্যে প্রাণ ও মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ সঞ্চারিত হয়; ষষ্ঠ মাসে ভ্রূণের হাত, পা, নাক, মুখ, কান ও হৃৎপিণ্ড বাড়িয়া চলে; সপ্তম মাসে অঙ্গ-প্রতঙ্গ পূর্ণ হওয়ায় ভ্রূণ গর্ভে নড়াচড়া করে; অষ্টম মাসে ভ্রূণের শরীরে অষ্ট অবয়ব দৃঢ় হইয়া যায়; নবম মাসে প্রসব হয়-হয় অবস্থায় ভ্রূণ একবার দ্বারের দিকে আসে ও আবার ভিতরের দিকে গিয়া আত্মগোপন করে; দশম মাসে ভ্রূণের চক্ষু ফুটে ও নাড়ীর গাঁট ছিঁড়িয়া যায় এবং ইহা যেই পথে গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথে আসিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

পঞ্চম অধ্যায়—দশরত্ন বিচার: মাতৃগর্ভে ভ্রূণের শরীরে মায়ের চারিবস্তু, যথা—গোশ্‌ৎ (মাংস), পোশ্‌ৎ (চামড়া), পশম (লোম), খুন (রক্ত), পিতার চারি বস্তু যথা—অস্থি, মজ্জা, শৌর্য, বীর্য, অনাদ্য ধর্মের (করতারের) দশ রত্ন, যথা—১. বচন বা বাক্‌শক্তি, ২. শ্রবণ বা শ্রবণশক্তি, ৩. নাসিকা বা ঘ্রাণশক্তি, ৪. লোচন বা দৃষ্টিশক্তি, ৫. ঈমান বা সৃষ্টায় বিশ্বাস, ৬. বুদ্ধি বা মননশক্তি, ৭. চেতনা বা অজ্ঞতানাশিনী শক্তি, ৮. জীবন বা প্রাণদায়িনী শক্তি, ৯. রুহ্ বা আত্মা, ১০. শরীর, ইত্যাদি দেওয়া হইয়া থাকে। তারপর শরীরে দশদ্বার বসাইয়া দেওয়া হয়। ইহার কথা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়—দশদ্বার বিচার: অতি যত্ন সহকারে মানব শরীরে প্রভু-করতার মায়ের চারি বস্তু, বাপের চারি বস্তু এবং তাঁহার নিজের দশ রত্ন দান করিয়া ইহাকে স্বয়ম্ভর করার জন্য দশটি দ্বার ইহাতে যোগ করিয়া দেন। তাহা এইরূপ,—১. মুখ বিবর, ২. কর্ণরন্ধ্র, ৩. নাসাপথ, ৪. অক্ষিগোলক, ৫. জিহ্বাতল বা জলদ্বার, ৬. স্তন বা দুগ্ধদ্বার, ৭. ইন্দ্রদ্বার বা মূত্রদ্বার, ৮. উপস্থ বা জননেন্দ্রিয়, ৯. পায়ু বা মলদ্বার, ১০. ব্রহ্মরন্ধ্র বা গূঢ়দ্বার। দশম দ্বার (ব্রহ্মরন্ধ্র) পথেই প্রাণ মানব দেহে প্রবেশ করে এবং যখন দেহত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাওয়ার সময় হয়, তখন দেহের প্রতি ফিরিয়া না চাহিয়াই প্রাণ দেহস্থ দশটি দ্বারের যেই কোনটির পথে সম্ভবপর, সেই পথেই পলাইয়া যায়। প্রাণ যখন দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন দেহকে কবর দেওয়া হউক, আর অগ্নিযোগে জ্বালাইয়া ফেলা হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাই,—

পিণ্ডে অনুমান করি জাহেদে জে কয়।
দুই চক্ষু মুদিলে কেহো কারো নয়॥

সপ্তম অধ্যায়—ঘটতত্ত্ব বিচার: 'যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে' অর্থাৎ যাহা 'ভাণ্ডে', 'ঘটে', 'দেহে', 'শরীরে' (একই অর্থে ব্যবহৃত) নাই, তাহা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নাই; অন্য কথায়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই দৃশ্য বা অদৃশ্য অবস্থায় ক্ষুদ্রাকারে মানুষের দেহে বর্তমান।—এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই এই অধ্যায় রচিত হইয়াছে। তাই দেখা যায়,—মানব-দেহে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল, শ্বাস-বাক্-মজ্জা, একুশ হাত অন্ত্র, বত্রিশটি দন্ত, দুই হাত

দুই পা, কুড়িটি আঙুল, বিশ আঙুল ফেফড়া, সাড়ে তিন কোটি লোম, নয় আঙুল পিত্তকোষ, বার আঙুল হৃৎপিণ্ড, (তাহার উপর) দুই স্তনযুক্ত বুক, তিন শত ষাটটি গ্রন্থি, নবদ্বার ও বাহাত্তর কোঠা-সমন্বিত তিন শত হাত সূক্ষ্ম নাড়ীজড়িত দুর্ভেদ্য দেহ-কুটীরে ইঙ্গলা ও পিঙ্গলা নামক দুই প্রধান নাড়ী, সুমেরু ও কুমেরু পর্বত, বন-জঙ্গল-জীব-জন্তু, নরলোক ও দেবলোক, রক্ষক-ভক্ষক-সেবক, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-যুগ, ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব নামক চারি বেদ, তৌরীত-জবুর-ইঞ্জীল-ফুরকান নামক চারি কিতাব, লবণ-ইক্ষু-সুরা-ঘৃত-দধি-ক্ষীর-উদক নামক সপ্ত সমুদ্র বিরাজিত। তাই,—

সেক জাহেদ কএ　　জানিলুঁ জে নিশ্চএ
ঘট কৈল গোসাঞি ভাণ্ডার।
সংসারেতে জথ দেখোঁ　　সব জে উহাতে লখোঁ
ঘট হৈতে সকল প্রচার॥

অষ্টম অধ্যায়—আউটি বিচার : যেই সব মূল উপাদানে 'আউটি' (অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত মানব-দেহ) গঠিত, সেই তত্ত্ব এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। মুসলিম দর্শনে মানব-দেহ গঠনের উপাদানের সংখ্যা হইল চার, যেমন—আব, আতশ, খাক, বাদ এবং হিন্দু-দর্শনে তাহা পাঁচ, যেমন—ক্ষিত্যপ্তেজো-মরুৎব্যোম। শেখ জাহেদ মুসলিম-দর্শনের অনুরূপ চারি উপাদানের (মৃত্তিকা, অনল, বরুণ, বাউ) কথা স্বীকার করিয়া লইয়া, শরীরের কোন্ বস্তু কোন্ (যেমন, 'ফেফড়া' বা ফুস্‌ফুস্ জলের, 'কলিজী' বা হৃৎপিণ্ড অগ্নির, 'তনু' বা দেহ মাটির, 'দিল' বা প্রাণ শরীরস্থ পঞ্চ-বায়ুর) উপাদানে গঠিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

শরীর মধ্যস্থ উপাদানগুলির অবস্থিতি রহস্যময়। ইহাদের রঙই তাহার প্রমাণ। এই রঙ্ এইরূপ—

জলের রঙ্ 'স ত'=সিতি বা শ্বেতবর্ণ
অনলের রঙ্ 'ক ল'=কাল বা কৃষ্ণবর্ণ
বায়ুর রঙ্ 'স ব জ'=সবুজ বা সব্জ বর্ণ
মৃত্তিকার রঙ্ 'জ র দ'=জরদা বা পীত বর্ণ

পৃথিবীতে যত রঙ্ আছে, এই চারি রঙ্ হইতেই তাহার উৎপত্তি।

সংসারে যত তরু আছে, তাহার শিকড় আছে। এই শিকড় ছেদন করিলে, তরু মরিয়া যায়। কায়া-তরু (ক ত)-রও শিকড় আছে; এই শিকড় উল্টামুখী; কেহ তাহার সন্ধান জানে না।

অপবিত্র সংসারকে জল ধুইয়া পবিত্র করে; অপবিত্র জলকে বায়ু পবিত্র করে এবং শূন্য (স ন) অপবিত্র বায়ুকে পবিত্র করে।

প্রভু স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে, ইহা সুখস্থান, আনন্দধাম; এখানকার জল সুবাসিত ও বায়ু চন্দন-গন্ধে ভরপুর; এখানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা আনন্দে থাকেন এবং তাঁহাদের ক্ষুধা-

তৃষ্ণা থাকে না। মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় থাকা কালেই মানব-শরীরে এই স্বর্গকে স্থাপন করা হয়। ইহা যতই অদ্ভুত ব্যাপার হউক না কেন, প্রভু ইহার চেয়েও অধিক অদ্ভুত কাজ করিতে পারেন। তাঁহার অঘটন-ঘটনপটীয়সী-শক্তি (মায়া) কে বুঝিতে পারে? তিনি জীবিতকে মৃত এবং মৃতকে জীবিত করিয়া থাকেন। চিন্তনীয় ব্যাপার হইল এই যে—

পক্ষিগণ হৈআ তারা মরা ডিম্ব পাড়ে।
লাড়িআ চাড়িআ দেখ সেহি নাহি মরে॥

'আদ্য-পরিচয়ে'র ভাষা

এই পুস্তকের ভাষা (১৪৯৮ খ্রী.) এই সময়ের অন্যান্য পুস্তকের, যেমন—মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' (১৪৮০) বিজয় গুপ্তের 'মনসা-মঙ্গল' (১৪৯৪), বিপ্রদাস পিপিলাইর 'মনসা-মঙ্গল' (১৪৯৫), শাহ মোহাম্মদ সগীরের 'ইসুফ-জলিখা' (১৩৮৯-১৪১০) প্রভৃতির ভাষার সহিত বিশেষ কোন ভাষা-বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট নহে। তবে, ছোট-খাট বৈশিষ্ট্য যে নাই, তাহা নহে। আগেই বলিয়াছি পুস্তকটি সূফী, যোগ, তন্ত্র-শাস্ত্রের ত্রিবেণীসঙ্গম। এই সমস্ত দিক হইতে বিবেচনা করিলে সাহিত্য-রসাবিবর্জিত ভাষায় রচিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ বলিয়া ইহাকে উল্লেখ করা যায়। এতৎসত্ত্বেও, পুস্তকটির একটি চরণে লেখকের সাহিত্যিক-মন বিদ্যুদ্দীপ্তির মতো হঠাৎ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে। ভ্রূণকে মাতৃ-জঠরে যেই কৌশলে প্রভু গোপনে রাখিয়া দেন, তাহার কথা বলিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন—

উদরে রাখেন গোসাঞি করিআ প্রবন্ধ।
পুষ্পের মধ্যেত জেন লুকাএ সুগন্ধ॥

এইস্থানে লক্ষণীয় বিষয় এই—মাতাকে পুষ্পের ও তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানকে পুষ্পের সুগন্ধির সহিত কবি তুলনা করিয়াছেন। পুষ্পের অভ্যন্তরে যেমন সুগন্ধি অনাঘ্রাত অবস্থায় লুকাইয়া থাকে, মাতৃগর্ভেও ভ্রূণকে তদ্রূপ অতি যত্নে মাতা গোপনে আবৃত করিয়া রাখিয়া দেন। চরণ দুইটি উপমার সার্থকতায় ও কাব্য-সৌন্দর্যের দীপ্তিতে সেই অতীত যুগের সাহিত্য-সম্পদে একরূপ অতুলনীয়। বর্তমান যুগে আসিয়া যখন রবীন্দ্রনাথের শিশুর 'জন্মকথায়' মায়ের মুখে নিম্নোদ্ধৃত চরণ কয়টি—

'সৌরভেতে যখন হিয়া উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।' ইত্যাদি

শুনিতে পাই, তখন 'আদ্য-পরিচয়ের' চরণ দুইটির কাব্য-সৌন্দর্যানুভূতি যেন আরও একটু ঘনীভূত, এবং আরও একটু মর্মস্পর্শী হইয়া উঠে।

কাব্যটি আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও নানাবিধ রহস্যময় তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। বলাবাহুল্য, সর্বত্র রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত আছে; কিন্তু রহস্যদ্বার উন্মুক্ত করার কোন প্রয়াস নাই। লেখকের মন সর্বত্র উদার; চিন্তাধারাও সীমাবদ্ধ নহে; তিনি নিঃসঙ্কোচে

সূফী, যোগ, তন্ত্র, মন্ত্র যত্রতত্র ইচ্ছামত অথবা আবশ্যক মত মিশাইয়া দিয়াছেন। ফলে গ্রন্থখানি মুসলিম-বাংলার অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারার ইতিহাসে একদিকে যেমন প্রাচীনতম, অন্যদিকে তেমন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বলিতে বাধা নাই, মুসলিম-বাংলার অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারার বিবর্তনের ইতিহাসে এই গ্রন্থখানিকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলিবে না।

'আদ্য-পরিচয়ে' মাত্র দুই প্রকারের ছন্দই পর্যায়ক্রমে, ব্যবহৃত হইয়াছে: তাহার একটি হইল 'লিপ্রছন্দ' বা 'পয়ার' এবং অপরটি হইতেছে 'দীর্ঘছন্দ' বা 'ত্রিপদী'। কিন্তু, ছন্দদ্বয়ের কোনটিই কবির হাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই। অন্ত্যানুপ্রাসে গরমিল, মাত্রাবিন্যাসে বিশৃঙ্খলা, যতি নির্ধারণে অসংযম প্রভৃতি অপূর্ণতার লক্ষণ এই পুস্তকের যত্রতত্র অত্যন্ত সুলভ। এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, যখন এই পুস্তক রচিত হয় (১৪৯৮) তখন পর্যন্ত বাংলা ছন্দ সর্ববিষয়ে পূর্ণতা লাভ করে নাই। প্রধানতঃ এই কারণেই বহিটির রচনা মধ্যযুগের মধ্যবর্তী কালের ইঙ্গিতবহ।

পুস্তকটির 'গৌরচন্দ্রিকা' ব্যতীত অবশিষ্ট আটটি অধ্যায়ই শুধু পঠিত হইত না, বরং রাগ-রাগিণী সহযোগে গীত হইত। এই জন্যই প্রত্যেক অধ্যায়ের শীর্ষ দেশে ছন্দের নামের সহিত রাগ-রাগিণীর নামও লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত রাগ-রাগিণীর মধ্যে এই গুলিই দেখিতে পাওয়া যায়,—

> শ্রী গান্ধার রাগ, সৈন্ধবী রাগ, ভৈরবী রাগ, বরাড়ী রাগ, শ্রীরাগ, দেশাগ রাগ ইত্যাদি।

আমরা সঙ্গীত শাস্ত্রে একান্তই অজ্ঞ বলিয়া এই রাগ-রাগিণী গুলির বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ সম্ভবপর নহে। বোধ হয়, এই কথা বলা যায় যে, শেখ জাহেদ সঙ্গীত চর্চা করিতেন; আর মারিফত-পন্থী বা অধ্যাত্ম-বাদী সাধকেরা যে সঙ্গীত সহযোগে হৃদয় উদ্দীপ্ত করিতেন, সেই কথা কে না জানে?

শব্দ-সম্পদের (Vocabulary) দিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, বক্ষ্যমাণ পুস্তকের পাণ্ডুলিপিটি বর্ণবিন্যাসে পুরাপুরি প্রাচীনত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই। কারণ, প্রতিলিপিকার 'নিমাঞি চরন দাস' যতই 'জথা দৃষ্টং তোথা লিখিতং দোস নাস্তিকং' বলিয়া দোহাই পাড়ুন, তিনি যে স্বীয় অনবধানতা অথবা অক্ষমতার জন্য তাঁহার সময়কার অর্থাৎ প্রায় দেড় শত বৎসর আগেকার বানানের সহিত তাঁহার সময়ে প্রচলিত বানান মিশাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি যেই আদর্শ-পুঁথির পাঠ গ্রহণ করিয়া নকল করিতেছিলেন, তাহা স্থানে স্থানে পড়িতেই পারেন নাই; তাই কিছু কিছু কথা বা শব্দসমষ্টি এবং বেশ কিছু সংখ্যক শব্দ 'ছাড়' (Lacuna) দিয়াছেন। আমরা চেষ্টা করিয়াও শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারি নাই; তবে বন্ধনীর মধ্যে আমাদের চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যাইবে; যথা—

কত আছে রক্ষক ধূর্ত্ত আর সেবক
ঘটে আছে ব্রহ্মা (ম)হেশ।।
এহিত সরির মাঝে চারি রগ রহি আছে
সংসারে সদা রাখে বান্দা।
সত্য ত্রেতা দ্বা(পর) কলি মহা প্রখর
ইহাতে জানিএ ভাল মন্দা।।

এহিত শরীর মাঝে চারি খান বেদ আছে
জাহাতে সক (----)চএ।
বগে বৈসে ঋগ্বেদ সা(ম) অথর্ব ভেদ
ইহাতে সকল সঞ্চএ ॥

পাণ্ডুলিপির বানানের নমুনায় দেখা যায়, এক শব্দের বানান সর্বত্র একরূপ না হইয়া নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; যথা—

ক. সং. √ভূ-ধাতু হইতে উদ্ভূত বাং. √হ -ধাতু আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে নাম পুরুষের বর্তমান কালের রূপে কখনও 'হএ', কখনও 'হয়ে', আবার কখনও 'হয়' রূপে লিখিত হইয়াছে।

খ. সং. √রক্ষ্-ধাতু হইতে বিবর্তিত বাং. √রাখ্-ধাতু লেখায় যেই সমস্ত রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা এইরূপ—রাখিআ, রাখিয়া, রাখএ, রাখয় ইত্যাদি।

গ. নেতিবাচক সংস্কৃত অব্যয় 'ন' কখনও 'ন', কখনও 'না', কখনও 'নাই', কখনও নাঞি, আবার কখনও 'নাঞিক', 'নাহি' রূপে লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ এক শব্দের ভিন্ন বানানের উদাহরণ অনেক। সম্পাদিত পুস্তকে ভাষার বোধ-সৌকর্যার্থে প্রাচীনতার ভিত্তিতে বানানের সমতা রক্ষার চেষ্টা করা হইলেও, নানা-কারণে তাহা সর্বত্র সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমতা রক্ষিত হইয়াছে।

ভাষা-সম্পদের দিক হইতেও 'আদ্য-পরিচয়ের' পাঠ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ইহাতে আবশ্যক মতো এই সময়ের অন্য পুস্তকের ভাষার সহিত তুলনা করা সহজ হইবে। এই পুস্তকের তিন স্থান হইতে এক এক শত শব্দের তিন অংশ ঠিক করিয়া লইয়া শব্দ-গোত্র চিহ্নিত করিয়া গড় কষিয়া দেখা যাইতেছে, ইহাতে গড়ে—

	তৎসম (খাস সংস্কৃত)	শব্দের	পরিমাণ	শতকরা	৪০
অ-তৎসম = ৬০%	অর্ধ-তৎসম	,,	,,	,,	৬
	তদ্ভব	,,	,,	,,	৫১
	দেশী	,,	,,	,,	২
	বিদেশী	,,	,,	,,	১
				মোট	১০০

দেখা যাইতেছে, পুস্তকটি মারিফত্, যোগ ও তন্ত্র সম্পৃক্ত হইলেও, ইহাতে বিদেশী অর্থাৎ ফার্সী ও তৎসূত্রে আরবী (হিন্দী শব্দ বিদেশী হইলেও বিদেশী বলিয়া গণ্য করা হইল না) শব্দের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশ মুঘলদের পদানত হয় ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে এবং তাহার পর হইতেই মুঘল-শাসনের সূত্র ধরিয়া রাষ্ট্রভাষা ফার্সীর প্রভাব সমাজে, সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মনে রাখিতে হইবে, আলোচ্য পুস্তক পৌনে এক শতাব্দী পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

সেই জন্যই ইহাতে বিদেশী শব্দের সংখ্যা অল্প বলিয়া মনে করিতে হইবে। নিম্নে আমরা তাহার একটা তালিকা দিলাম :

আদম	আ.	জঞ্জাল	} —হিন্দী
আলামিন	আ.	কলিজা	
ইমান	আ.	জড়	
ইলাহি	আ.		
কিতাব	আ.	দিল	ফা.
খালি	আ.	দেও	ফা.
চিজ	ফা.	বাত	ফা.
জরদা	ফা.	ফরজা	আ.
জাহেদ	আ.	মগজ	ফা.
তন	ফা.	মানি	আ.
রুহ	আ.	মুসলমান	ফা.
শেখ	আ.	রগ	ফা.
সবুজ	ফা.	রঙ্গ	ফা.

এই প্রসঙ্গে বর্ণ-বিন্যাস-সম্পর্কিত কয়েকটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। ইহাতে আমাদের ভাষা-বিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু আলোক-পাত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :

ক. প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে শব্দাদ্যস্থিত 'অ-' উচ্চারণে দীর্ঘ হইয়া 'আ-' ধ্বনির বৈশিষ্ট্য লাভ করিত এবং তাহা লিখায় আত্মপ্রকাশ করিত, যথা— সং. অনল > আনল ; সং. অন্তর > আন্তর ; সং. অধিক > আধিক ; ইত্যাদি

খ. ঐ সময়ে তো বটেই, এমন কি এখনও, বাংলা ভাষায় শব্দাদ্য 'ক্ষ'- (ক্ + ষ) 'খ'-রূপে উচ্চারিত হইয়া লেখায় আত্মপ্রকাশ করিত, যথা—
সং. ক্ষিতিজল > খিতিজল ;
সং. ক্ষণ > খেন ; সং. ক্ষয় > খএ ; ইত্যাদি
শব্দ মধ্যবর্তী অথবা শব্দান্ত্য-'ক্ষ' = 'ক্খ', যেমন—রক্খা

গ. ঐ সময়ে অন্তঃস্থ-'য' (ইঅ) ধ্বনি শব্দের আদিতে ব্যবহার করিতে হইলে, উচ্চারণে বর্গীয়-'জ' এর অনুরূপ হইয়া গিয়াছিল, এবং এখনও তাহাই আছে, যথা—

সং. যাবৎ > জাবত ; বাং. যায় > জাএ ; যেই > জেই ; ইত্যাদি

ঘ. বাংলা উচ্চারণে তখনও শব্দান্ত্য-'আ' স্বর 'য়'-শ্রুতিতে আত্মপ্রকাশ করে নাই। তাই দেখা যায়,—'করিয়া' স্থলে 'করিআ' ; 'হয়' স্থলে 'হএ' ; 'গিয়া' স্থলে 'গিআ' ; 'হিয়া' স্থলে 'হিআ' ; সং. বর্ধতে > বড়এ > বাঢএ পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া গিয়াছে, 'বাড়য়' হয় নাই।

ঙ. পূর্ববর্তী নাসিকা-ধ্বনির প্রভাবে শব্দান্ত্য ব্যঞ্জনাশ্রিত স্বরের ব্যঞ্জন-ধ্বনি লোপ পাইলে, তৎস্থলে 'ঞ' নাসিকা-ধ্বনির আগম হয়, যথা—'নাহি' স্থলে 'নাঞি'; 'নিমাই' স্থলে 'নেমাঞি'; 'নাহিক' স্থলে 'নাঞিক'; সং. গোস্বামী > গোসাবাঁী > গোসাঞি।
লক্ষণীয়—ফারসী. মিয়াঁ > মিঞা
সং. ভৌমিক > ভূইঁঅ > ভূঞা } আধুনিক

চ. সর্বনাম পদে কেবল একটি প্রাচীন রূপ রক্ষিত হইয়াছে এবং তাহা হইল 'উত্তম পুরুষের এক বচনের রূপ' 'মুঞি'। ইহা প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষার = সংস্কৃত 'ময়া' = ময়েন > মএঁ > মইঁ > মুঞি (তুল. আধুনিক আঞ্চলিক 'মুই')। 'মুঞি'-র বহু বচনে মধ্যযুগীয় 'আহ্মি' রক্ষিত না হইয়া আধুনিক 'আমি' রূপ ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু মধ্যযুগের 'বহুত্ব'-বৈশিষ্টটি ত্যাগ করিয়া তখনও বর্তমানের 'একত্ব' বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নাই। নিম্নে তাহা ক্রিয়াপদের ব্যবহারে দেখানো হইল :

ক্রিয়াপদ

কালভেদ		পুরুষ	এক বচন	বহু বচন
নিত্যবৃত্ত	বর্তমান	উত্তম	মুঞি করোঁ, কহোঁ, স্বজোঁ	আমি করি, কহি,
ঘটমান	,,	,,	,, করহুঁ = করিতেছি, স্থনাহোঁ = শুনাইতেছি	
	বর্তমান অনুজ্ঞা	মধ্যম	তুমি স্থনহ, করহ,	তোমরা স্থনহ, করহ
নিত্যবৃত্ত	বর্তমান	নাম	সে করএ, বাঢ়এ, খাএ	তাহারা জন্মাএ,
		,, অনুজ্ঞা	সে করৌক, করু	কহএ, কহে
সাধারণ	অতীত	উত্তম	মুঞি আইলাঙু, জানিলুঁ আছিলাঙু, বুঝিলুঁ	আমি করিল
,,	,,	মধ্যম	তুমি × ×	তোমরা × ×
,,	,,	নাম	সে (গুরু) কহিল, রচিল	তাহারা × ×
সাধারণ	ভবিষ্যৎ	উত্তম	মুঞি দিমু, কহিমু, পাইমু,	আমি লিখিব, কহিব,
,,	,,	মধ্যম	তুমি × ×	তোমরা × ×
,,	,,	নাম	সে জাইব, হৈব, বাঢ়িব	তাহারা করিব

এতদ্ব্যতীত সম্মানার্থে 'আপন' শব্দ সর্বনামে দেখা যায়, যেমন—'আপনার দশরত্ন দেয়ন্ত (অন্যত্র 'দেন্ত') তাহারে'। 'দেয়ন্ত' বা 'দেন্ত' বহু বচনের পদ। সম্মানার্থে এক বচনের স্থলে বহুবচনের পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

কতিপয় তথ্য বিবরণী

'আদ্য-পরিচয়' একখানি নানা তত্ত্ব ও তথ্যাশ্রিত পুস্তক। ইহা পাঠ করিলে এই কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সূফী, যোগ ও তন্ত্র,—প্রধানতঃ এই ত্রিশাস্ত্রীয় তন্ত্রজালে জট পাকাইয়া এই অদ্ভুত পুস্তকটি 'হিতকথা'—রূপে অর্থাৎ লোকের অধ্যাত্ম মঙ্গলবিধায়ক ব্যবস্থারূপে রচিত হইয়াছে। এই সমস্ত পুস্তক ব্যবহারে অধিকারিভেদ আছে। ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অধিকার আমার নাই। সুতরাং, তত্ত্বালোচনা বাদ দিয়া অতি সংক্ষেপে তথ্যালোচনার মাধ্যমে পুস্তকটির বিষয়বস্তু বুঝিতে পারা যায় কি না, সেই বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া গেল।

ক. সূফী-তত্ত্ব

সলাত্ (=নমাজ), সওম্ (=রোজা), হজ্জ্ ও জকাত্ নামক অনুষ্ঠান-চতুষ্টয়-সম্বলিত এক অনাদি, অনন্ত ও অজ্ঞাত সত্তায় বিশ্বাসের (=ঈমান) নাম ইস্‌লাম। ইহাতে 'সূফী-তত্ত্বের' কোন স্থান না থাকিলেও, ইসলাম প্রচারের প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে ইহা ইসলামে স্থান করিয়া লইয়াছিল। তখন ইসলাম-ধর্মে 'শরীয়ত্' ও 'মারিফত্' অর্থাৎ কর্মকাণ্ড ও তত্ত্বোপলব্ধি সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'মারিফত্' বা তত্ত্বোপলব্ধি অবলম্বনেই সূফী মতবাদের উদ্ভব, বিকাশ ও স্থায়িত্বপ্রাপ্তি ঘটে। ইসলামের এই 'মারিফত্' যেই দেশে গিয়াছে, সেই দেশের অধ্যাত্মদর্শন ও অনুষ্ঠানাদির সহিত একটি সমঝোতা করিয়া লইয়াছে, অথচ 'শরীয়ত' তাহা করে নাই। বাংলাদেশেও অবিকল এই একই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে। মৎপ্রণীত A History of Sufi-ism in Bengal Published by Asiatic Society of Bengladesh পাঠ করিলে এবিষয়ে অনেক ব্যাপার জানিতে পারা যাইবে।

সূফীরা 'গুরুবাদী' অর্থাৎ 'পীরবাদী' মুসলমান। এই 'পীরবাদ' ইরানী প্রভাবে প্রভাবিত একটি প্রাচীন মতবাদ মাত্র। বৌদ্ধ বৃদ্ধেরা হইতেছেন 'থের' (Thera) আর ইরানী বৃদ্ধেরা হইতেছেন 'পীর' (پیر = Pir)। উভয় শব্দের অর্থ 'বৃদ্ধ'। মানুষ বৃদ্ধ হইলেই জ্ঞানী হয়,—এই ধারণা হইতেই শব্দ দুইটি ইন্দো-ইরানীয় আর্য শাখার প্রাচীন ভারতীয় 'স্থবির' [Sthavira (সংস্কৃত)] শব্দ হইতে উৎপন্ন, যেমন—

ক. ইরানীতে সংযুক্ত আদ্য-'স্থ' বাদ দিয়া 'স্থবির>বির>পীর;'
খ. ভারতীয় পালিতে আদ্য-'স' বাদ দিয়া
সং. স্থবির>থবির>থের (তুল. থেরবাদ)।

'গুরুবাদ' ও 'পীরবাদ' সর্ববিষয়ে, এমন কি বিশ্বাসেও, সমস্থানীয় ও সমপর্যায়ের ব্যাপার। সুতরাং, গুরুবাদ ও পীরবাদ পরস্পর পরস্পরকে যে প্রভাবিত করিবে, প্রকৃতপক্ষে করিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার মত কিছুই নাই।

সূফীরা হজরত মুহম্মদকে(দঃ) আল্লার প্রেরিত পুরুষ (রসূল) হিসাবে স্বীকার করিলেও, মূল বা আদি গুরু রূপে সমধিক মান্য করেন। খোদাকে প্রভু (রব্ব্) রূপে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবার জন্য হজরত মুহম্মদ (দঃ) নমাজ-রোজার ন্যায় যেই অনুষ্ঠানাদির প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহাতে 'ঈমান' বা আল্লাহ্ তায়ীলায় বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারও রহিয়াছে বটে, তবে খোদাপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠান চতুষ্টয় ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা

স্থান পায় নাই। সূফীরাই এই বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ইহার নাম দিয়াছেন 'মারিফত্'। হজরত মুহম্মদ(দঃ) 'শরীয়তে' জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং 'মারিফত্' নিজের মধ্যে গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। একমাত্র হজরত আলীকেই তিনি এই গুপ্ত-জ্ঞান (মারিফত্) দান করেন এবং আলীও বহুদিন গোপন রাখিয়া পরিশেষে তৎপুত্র হাসান ও হোসেনকে তাহা দান করেন। আলীর পুত্রদ্বয় তাহা হাসান বসরীকে দিয়াছিলেন। হাসান বসরীর কাছ হইতে তাহা ধীরে ধীরে পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং, 'মারিফত্' এমন এক জ্ঞান, যাহাকে 'সিনা-ব-সিনা' বা বুকে-বুকে পরিচালিত 'গুরুমুখীবিদ্যা' বলা যায়

সূফী-মতেও 'সৃষ্টিতত্ত্ব' আছে। তাঁহারা কুর্‌আন্ শরীফে প্রদত্ত আল্লার সত্তার সংজ্ঞা "ব্-ল্লাহু নূরু-'স-সমাওয়াতি ব্-'ল-অর্‌দি"—'আল্লাহ স্বর্গমর্ত্যের জ্যোতিঃ' নির্দ্বিধায় স্বীকার করিয়া বলেন আল্লাহ্ যখন জ্যোতির্ময় সত্তা, তখন আদিতে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে একমাত্র অন্ধকার ছিল ; তাই আল্লাহ্ জ্যোতিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করিলেন : তাঁহার 'নূরের' (জ্যোতির) এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম কণা দিয়া সৃষ্টি করিলেন 'নূর্-ই-মুহম্মদী' বা মুহম্মদের 'নূর' এবং ইহার এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম অংশ দিয়া সৃষ্টি করিলেন নিখিল চরাচর। সৃষ্টির ইচ্ছা হইবা মাত্র আল্লাহ্ তায়ালা বলিলেন - 'কুন্' (সৃষ্টি) হউক, অমনি 'ফ-য়কূন্' (সৃষ্টি) হইয়া গেল সব কিছুই : ফেরেশতারা সৃষ্ট হইলেন : ইঁহারা 'নূরের' বা জ্যোতির সৃষ্টি ; আল্লার হুকুম পালন ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না ; কেননা তাঁহারা স্বয়ংক্রিয় সত্তা নহে। শয়তানের সৃষ্টি হইল ; ইহারা 'নার' বা অগ্নির সৃষ্টি ; ইহারা ক্ষতিকারক স্বয়ংক্রিয় সত্তা। গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী,—এক কথায় নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি হইল।

ইহাতে আল্লাহ্ তায়ালার বাসনা পূর্ণ হইল না। তিনি মাটি দিয়া 'আদম' বা মনুষ্য সৃষ্টির বাসনা ফেরেশতাদের কাছে ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—'ইন্নী জায়িলুন্ ফী-'ল্-অর্‌দি খলীফহ্'—'নিশ্চয় আমি আদমকে অর্থাৎ মনুষ্যকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতে চাই'। মানুষ আল্লার উপাসনা করিবে, ইহাই তাঁহার বাসনা। ফেরেশতারা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহারাই তো অহোরাত্র খোদার উপাসনা করিতেছেন, আবার উপাসনার জন্য মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া কাজ কি ? অধিকন্তু, মানুষ পরস্পর খুনাখুনি করিয়া জগৎকে রক্তরঞ্জিত করিয়া ধ্বংস করিবে। আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদের এই আপত্তি না শুনিয়া মানুষ সৃষ্টি করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি যাহা জানি, তোমরা তাহা জান না।' অতএব, মানুষ সৃষ্টি হইল। অতঃপর, ফেরেশতারা 'আদম'-কে (মানুষকে) সজিদা করিতে আদিষ্ট হইলে একমাত্র ইব্লিস বা শয়তান ব্যতীত সকলেই 'আদম'-কে সজিদা করিলেন। শয়তান অভিশপ্ত হইল।

সূফীরা 'জিকির' বা জপ, 'নফ্‌স্' বা রিপু, 'লতীফা' বা আলোক-চক্র, 'মুরাকিবহ্' বা ধ্যানাসন, তিন প্রকারের 'ফনা' বা একাত্মতা, যেমন 'ফনা' ফী-শ্-শেখ্' পীর বা গুরুর মূর্তি ধ্যানে নিমজ্জন, 'ফনা ফী-র্-রসূল্' বা রসূলের মূর্তি ধ্যানে নিমজ্জন, 'ফনা ফী-ল-লাহ্' বা আল্লার ধ্যানে নিমজ্জন প্রভৃতি বিশ্বাস ও অভ্যাস করেন। সূফীমতবাদের এই সমস্ত বিশ্বাস ও অভ্যাসে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

'আদ্য-পরিচয়' বাংলার অধ্যাত্ম-চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট একটি মূল্যবান মারিফতী গ্রন্থ। মারিফত বা সূফীতত্ত্বের চুম্বক হইল,—আল্লাহ্ ও মানুষ এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সম্বন্ধানুভূতির জাগৃতি। এই সম্বন্ধটি প্রভুত্বের নহে বরং প্রেমের। ইহার মধ্যে রসূলেরও

স্থান আছে এবং তাহা হইতেছে 'ঘটকের' বা প্রতিনিবিষ্টের। ইসলামিক ও অনৈসলামিক নানাবিধ ছোট বড় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সমাহারে আমাদের দেশের সূফীমত (লৌকিক ধারণায় 'ফকীরী-মত্') এক অদ্ভুত মূর্তিতে বিকশিত হইয়াছে। তাহার একটি অতি মনোজ্ঞ চিত্র আলোচ্য পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

খ. যোগশাস্ত্র বা যোগতন্ত্র

পতঞ্জলি মুনি বিরচিত শাস্ত্রের নাম 'যোগদর্শন' বা যোগশাস্ত্র এবং 'আদ্য-পরিচয়' পুস্তকের মতে 'যোগতন্ত্র'। খ্রীস্টপূর্ব ১৫০ দেড় শত বৎসর পূর্বে পতঞ্জলি মুনির আবির্ভাব ঘটে বলিয়া ডক্টর ভাণ্ডারকার [(রামকৃষ্ণ গোপাল) ১৮৩৬-১৯১৫] মত পোষণ করিতেন। 'যোগ' ভারতীয় ষড়্দর্শনের অন্যতম। যোগশাস্ত্র আট শাখায় বিভক্ত, যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ধারণা, ও সমাধি। এই আট শাখার প্রত্যেকটির প্রশাখা আছে। তাহা অতি সংক্ষেপে এইরূপ :

১. 'যম'—শাখার প্রশাখার সংখ্যা পাঁচ, যথা—অ. অহিংসা, আ. সর্বভূত-হিতকর সত্যবাক্য, ই. অস্তেয় অর্থাৎ পরস্ব গ্রহণ না করা, ঈ. ব্রহ্মচর্য, উ. অপরিগ্রহ অর্থাৎ সর্ববিধ ভোগ ত্যাগ।

২. 'নিয়ম'—শাখার প্রশাখার সংখ্যাও পাঁচ, যথা—অ. বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শৌচ, আ. সন্তোষ অর্থাৎ অল্পে সন্তুষ্টি, ই. ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ তপঃ, ঈ. স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদের নিয়মিত অধ্যয়ন, উ. প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরের ধ্যান।

৩. 'আসন'—শাখার প্রশাখার সংখ্যাও পাঁচ যথা—অ. পদ্মাসন, আ. স্বস্তিকাসন, ই. ভদ্রাসন, ঈ. বজ্রাসন, উ. বীরাসন।

৪. 'প্রাণায়াম'—শাখার প্রক্রিয়া ত্রিবিধ, যথা—অ. 'পূরক' অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরে নির্মল বায়ুর প্রবেশ করানোর অভ্যাস, আ. 'কুম্ভক' অর্থাৎ দেহের ভিতরে প্রবিষ্ট বায়ু অবরোধ করিয়া রাখার অভ্যাস, ই. 'রেচক' অর্থাৎ দেহ মধ্যস্থ আবদ্ধ বায়ুর নিঃসারণ করিয়া দেওয়ার অভ্যাস।

৫. 'প্রত্যাহার'—শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বিষয় হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করার প্রক্রিয়ার নাম যোগশাস্ত্রে 'প্রত্যাহার'।

৬. 'ধ্যান'—অনন্য-মনে অভিনিবিষ্টভাবে চিত্তের একাগ্রতা সাধনের পর মনকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অনুচিন্তনে নিযুক্ত রাখার নাম 'ধ্যান'। সূফী শাস্ত্রে ইহারই নাম 'মুরাকিবহ্' (مراقبه)।

৭. 'ধারণা'—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-সত্তায় মনকে নিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্থিতাবস্থা প্রাপ্তির নাম ধারণা'। সূফী শাস্ত্রে ধ্যানীর মনের এমন অবস্থার নাম 'মুশাহিদহ্' (مشاهده)।

৮. 'সমাধি'—ইহা যোগীর মনের চরম অবস্থা। এই অবস্থায় 'জীবাত্মার' সহিত 'পরমাত্মার' সংযোগ সাধিত হয়। তখন যোগী মনে করে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম'। সূফীশাস্ত্রে এই অবস্থার নাম انا الحق =অনা'ল্-হক্ অর্থাৎ আমিই (পরম) সত্য।

অন্যত্র দেখা যায়, 'যোগ' ত্রিবিধ, যথা—'মন্ত্র-যোগ', 'হটযোগ' ও 'লয়-যোগ'। এই তিন যোগ-মার্গের সাধকগণই চরম অবস্থায় 'রাজযোগের' জ্ঞানভূমি প্রাপ্ত হন। এই যোগ-মার্গ তিনটিকে যোগ-সাধনার তিন 'বিভাগ' নামে অভিহিত করা যায়। যোগের এই বিভাগত্রয়কে 'ক্রিয়াযোগ' নামেও চিহ্নিত করা হয়। ইহাদের শেষ অবস্থায় পৌঁছিলে যোগী 'রাজযোগ' প্রাপ্ত হয়।

গ. তন্ত্রশাস্ত্র

'আদ্য-পরিচয়'—পুস্তকের গৌরচন্দ্রিকায় অধ্যাত্মতত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া পারলৌকিক মুক্তি লাভ করার জন্য তিন-তিনবার তান্ত্রিক অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যেমন—যোগতন্ত্র, গর্ভতন্ত্র, সিদ্ধান্ততন্ত্র। সুতরাং, এই পুস্তক পাঠ ও অনুধাবন করার জন্য তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ-ধারণা পোষণ করা অত্যাবশ্যক।

সংস্কৃত-অভিধানে 'তন্ত্র'-শব্দটির নানা বাচকতা দেখা যায়। শব্দটি সচরাচর 'শাস্ত্র' বুঝাইয়া থাকে। তাই, ষড়্দর্শনের প্রত্যেকটি প্রণালীকে 'তন্ত্র' বলে। 'কাপিলতন্ত্র' ও 'গৌতম তন্ত্র' ইত্যাদি কথার দ্বারা কপিল ও গৌতম মুনির দর্শন বুঝায়। বৌদ্ধদের 'ক্ষণভঙ্গবাদ'-কে উল্লেখ করিতে গিয়া স্বয়ং শঙ্করাচার্য (খ্রী. ৮ম শতাব্দী) 'বৈনাশিক-তন্ত্র' কথা ব্যবহার করিয়াছেন। বিখ্যাত তান্ত্রিক ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য 'মীমাংসা-দর্শন' প্রণালীকে 'জৈমিনী-তন্ত্র' আখ্যা দিয়াছেন। অতএব, দেখা যাইতেছে 'তন্ত্র' শব্দে সচরাচর 'শাস্ত্র' বা যে-কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনাকেই বুঝাইয়া থাকে।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও 'তন্ত্র'-শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয়ে একমত নহেন। কেহ কেহ মনে করেন শব্দটি 'তন্ত্রি' অথবা 'তন্ত্রি' ধাতু—যাহার অর্থ 'ব্যাখ্যা করা'—হইতে উদ্ভূত। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ইহা 'তন্' ধাতু হইতে উৎপন্ন এবং ইহার অর্থ 'বিস্তৃত হওয়া'। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে—"The word 'tantra' means shortening abbreviation, i. e., reducing into something like algebric forms mantras or formula that would otherwise run to scores of syllables." (Notices of Sanskrit Manuscripts, 1, Preface, P. XXIV)

'তন্ত্র' শব্দে হ্রস্বীকৃত সংক্ষেপণ বুঝায়, অর্থাৎ বহু কথার মালায় প্রকাশ করিতে হয় এমন কোন দীর্ঘ বক্তব্যকে কতকটা বীজগণিতের সূত্র সমতুল্য সংক্ষেপিত রূপ দিলে, তাহা 'মন্ত্রে' পরিণত হয়। এইখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায় যে, বাংলায় 'তন্ত্রমন্ত্র' বলিয়া একটা কথা আছে। 'তন্ত্র' এবং 'মন্ত্র' যেন সমার্থক। 'মন্ত্র' উচ্চারণ না করিয়া কোন তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে শব্দটির উৎপত্তি এইরূপ :

সং. $\sqrt{\text{তন্}}$ (বিস্তৃত করা বা হওয়া) + ষ্ট্রন্(ত্র)(ণ). ক্লী. = তন্ত্র—যে শাস্ত্র দ্বারা শিব ও শক্তির উপাসনা বিস্তৃত করা হইয়াছে।

সে যাহা হউক, বাংলাদেশের তথা ভারতের ধর্মীয় জীবনে 'তন্ত্র' একটা বিরাট অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। এখন ইহা একটা দস্তুরমতো শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে অবহেলা করিলে বর্তমান হিন্দুধর্ম অচল হইয়া পড়িবে। জটিল আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় এই তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলি ভরপুর।

তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভবের স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে এখনও কিছুই ঠিক করিয়া নির্ণীত হয় নাই। ইহা যে ভারতে আর্যপূর্ব সভ্যতার একটি সাংস্কৃতিক নিদর্শন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই, ইহা ভারতের আদিম অধিবাসী ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে এখনও প্রবল প্রতাপে বিদ্যমান। তবে ইহাও সত্য যে, ভারতীয় আর্যেরা যখন ভারতীয় অনার্য-দিগকে ধীরে ধীরে আর্যসমাজভুক্ত করিয়া লইতেছিলেন, তখন তাঁহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শনের মধ্যে তন্ত্রকেও স্থান দান করিতেছিলেন। এইরূপেই তন্ত্রশাস্ত্র একটি সর্বভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।

এতৎসত্ত্বেও, বঙ্গদেশেই তন্ত্রের উদ্ভব ঘটে বলিয়া দেশ-বিদেশের অনেক পণ্ডিত মনে করেন এবং তাঁহারা যেই সমস্ত যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা অকাট্য না হইলেও অনুপেক্ষণীয়। ইঁহাদের মধ্যে প্রফেসর উইন্টারনিট্জ্ (Professor Winternitz) মহোদয়ের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। তিনি মনে করিতেন বঙ্গদেশেই 'তন্ত্রের' উদ্ভব ঘটে এবং এইদেশ হইতেই আসাম ও নেপালে 'তন্ত্রশাস্ত্র' বিস্তৃত হয়; এমন কি বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যস্থতায় ভারতের বাহিরে চীন ও তিব্বতেও 'তন্ত্র' ছড়াইয়া পড়ে। [History of Indian Literature—Eng. Tr. Calcutta University—Vol. I. P. 592] আসামের কামরূপ জেলার 'কামাখ্যা দেবী'-র মন্দির প্রাচীনযুগে ভারতীয় তান্ত্রিক যোগীর প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। এই স্থানেই 'মারণ', 'উচ্চাটন', 'বশীকরণ' 'স্তম্ভন,' 'বিদ্বেষণ', 'স্বস্ত্যয়ন,'—এই তান্ত্রিক 'ষটকর্ম' নিয়মিত অনুশীলিত হইত এবং এতদ্দ্বারা মানুষকে ভেড়া বানাইয়া রাখিয়া দিত বলিয়াও কুখ্যাতি আছে। 'পঞ্চ মকার' (অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন) ও 'শবসাধনা'-র অনুশীলন যেমন তন্ত্রশাস্ত্রীয় ব্যাপার, 'আগম' এবং 'নিগম'-ও তেমন তন্ত্রশাস্ত্রীয় বিদ্যা। আমাদের পঞ্জিকাগুলিতে যেমন বর্ষফল ঘোষণার জন্য গোড়ায় হর(শিব)-গৌরী (পার্বতী) সংবাদ দেওয়া হয়, 'আগম' এবং 'নিগম'-ও তেমন হর-গৌরীর মুখনিঃসৃত তন্ত্রশাস্ত্রীয় তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান সংবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তন্ত্রশাস্ত্রীয় যেই সমস্ত কথা শিবের (হরের) মুখ হইতে আগত, পার্বতীর (গৌরীর) শ্রবণে গত এবং বাসুদেবের (শ্রীকৃষ্ণের) মত্-সম্মত, সেই সমস্ত কথাসমষ্টির নাম আ-গ-ম=**আগম**' এবং যেই সকল তত্ত্বকথা পার্বতীর (গিরিজার) মুখ হইতে নির্গত, শিবের শ্রবণে গত এবং বাসুদেবের মত্-সম্মত, তাহারই নাম নি-গ-ম=**নিগম**।

তন্ত্রশাস্ত্রীয় পুস্তকের সংখ্যাও এ-যাবৎ সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। সচরাচর বলা হইয়া থাকে যে, তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থের সংখ্যা মোট ১৯২। তন্মধ্যে ৬৪ চৌষট্টিখানি নাকি গৌড়রাজ্যে অর্থাৎ বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ (আবির্ভাব কাল—খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী) এই গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করিয়া 'তন্ত্রসার' নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। আরও ৬৪ চৌষট্টিখানি তন্ত্রগ্রন্থ মিথিলা ও নেপালে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে করা হয়। এতদ্ব্যতীত আরও ৬৪ চৌষট্টিখানি তন্ত্রগ্রন্থ ভারতের অন্যত্র প্রচলিত ছিল ও আছে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা, বিহার ও আসাম,—ভারতের এই পূর্ব অঞ্চলেই তন্ত্রের প্রসার অত্যধিক। এই প্রভাব যে গভীর প্রভাবসূচক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাংলাদেশের, তথা ভারতের হিন্দুদের ধর্মীয়-জীবনে, বিশেষ করিয়া তাঁহাদের পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠানাদিতে স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব

সুস্পষ্ট। দেখিবার মতো চোখ এবং বুঝিবার মতো জ্ঞান থাকিলে এই প্রভাব বাছিয়া লইতে কষ্ট হইবার কথা নহে। বলিতে কি, আমাদের দেশে, তথা ভারতে হিন্দুধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নানা জাতি ও চিন্তাধারাকে আত্মস্থ করিয়া লইয়া বর্তমানে এক সংমিশ্রিত অথচ সংহত মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদ্যমান। এই ধর্ম অংশতঃ বৈদিক, অংশতঃ পৌরাণিক এবং অংশতঃ তান্ত্রিক। [The Tantras : Studies on their Religion and Literature : Chintaharan Chakravarti, Published by Punthi Pustak, Cal. 1972 P. 49.]

এমন বিমিশ্র হিন্দুধর্মের প্রভাবে এই দেশের মুসলমানেরাও নানা কারণে প্রভাবিত হইয়াছিল। তাহার প্রথম প্রমাণ গৌড়ে কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দী (মৃ. ১২১৮ খ্রী.) কর্তৃক কামরূপ হইতে আনীত 'অমৃতকুণ্ড' নামক তন্ত্রগ্রন্থটির 'হওজুল্ হায়াত্' নামে আরবী অনুবাদ (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। 'বাহারুল্ হায়াত' নামে 'অমৃত-কুণ্ড' ফার্সী ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছিল। 'আদ্য-পরিচয়ের' আবিষ্কার তাহার আর একটি প্রমাণ। ইহা ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়। সৈয়দ সুলতানের (ষোড়শ শতাব্দী) 'জ্ঞান-প্রদীপ', সৈয়দ মর্তুজার (সপ্তদশ শতাব্দী) 'যোগ-কালন্দর', এবং কানু ফকীরের (অষ্টাদশ শতাব্দী) 'আগম' এই তান্ত্রিক ধারার প্রভাব নির্দেশ করিতেছে। বিষয়টি এতই কৌতুকাবহ যে, এই বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা পরিচালিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

ঘ. সিদ্ধাতন্ত্র = নাথতন্ত্র

'আদ্য-পরিচয়' পুস্তকে মনুষ্যের উপকারার্থে 'হিতকথা' বা মানব-কল্যাণকর উপদেশ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া গৌর-চন্দ্রিকায় শেখ জাহেদ 'গর্ভতন্ত্র' 'যোগতন্ত্র' 'সিদ্ধাতন্ত্র' তত্ত্বকথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'সিদ্ধাতন্ত্রের' দ্বারা 'নাথ'-সিদ্ধাদের শাস্ত্রই বুঝানো হইয়াছে। কারণ, পুস্তকটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুইবার গোরক্ষনাথের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে,—

ইলিমিলি চন্দ্র বুলাইলেন গাএ।
গরল চন্দ্র ভক্ষিলেন শ্রী গোর্খনাএ ।।

ইহার পূর্বে 'এই চন্দ্র ভেদিআ গোর্খ কাইল কাহিনী' চরণটিতেও গোরক্ষনাথের নাম করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য, নাথপন্থী ৮৪ চুরাশী জন যোগী বা সিদ্ধাদের মধ্যে গোরক্ষনাথ অন্যতম। ইনি সর্বজনপূজ্য নাথসিদ্ধা। তাঁহার গুরু হইলেন মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ ; এবং মীননাথের (মৎস্যেন্দ্রনাথ) গুরু হইলেন আদিনাথ (শিব)। বলা ভাল, অনাদিনাথ বা 'নিরঞ্জন গোসাঁই' হইতে আদিনাথের উৎপত্তি ; কারণ অনাদিনাথের আর কোন আদি নাই ; সুতরাং তিনি স্বয়ম্ভু। প্রকৃতপক্ষে, গোরক্ষনাথই 'নাথ'-সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ গুরু। 'নাথ'-শব্দের অর্থ 'প্রভু'। যোগীরা দীক্ষান্তে 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিতেন। তাই, এই সম্প্রদায়ের সিদ্ধাদিগকে অনাদিনাথ, আদিনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ নামে পরিচয় দেওয়া হয়। ইঁহাদের মধ্যে আদিনাথ ও মীননাথ বাঙালী ছিলেন। চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলবর্তী সন্দীপ বা চন্দ্রদ্বীপে মীননাথের জন্ম গ্রহণ করার খ্যাতি এবং কুতুবদিয়ার আদিনাথের মন্দির, ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। চট্টগ্রামে যোগিসম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি (হিন্দু) বাস করেন। তাঁত বুনাই তাঁহাদের মূল পেশা। তাঁহারা সাধারণ্যে 'যোগী' নামে পরিচিত। যোগিসম্প্রদায়কে ('নাথ'-দিগকে) চিতায় দাহ করা হয় না, বরং মুসলমানদের মতো 'গোর' দেওয়া হয়।

'নাথপন্থীদের বিশ্বাস, শিব হইতেই নাথ ধর্ম জগতে প্রচারিত হয়, কালবশে উহা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে মৎস্যেন্দ্র উহার পুনঃপ্রচার করেন, এবং গোরক্ষনাথ উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।' (নাথপন্থ—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী—শ্রীকল্যাণী মিত্র)।

'নাথ'-যোগিগণের মধ্যে কে কতখানি ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। 'কানফাটা' যোগীদের গুরু এবং উত্তর-ভারতের সর্বত্র সমভাবে পূজনীয় গোরক্ষনাথ এবং তাঁহার গুরু মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ (মচিছন্দর নাথ) যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। উত্তর-প্রদেশের (বর্তমান-ভারতের) গোরক্ষপুরে ভারতবিখ্যাত গোরক্ষনাথের মন্দির এখনও পূর্ণ গৌরবে বর্তমান। তিনি নেপালী গুর্খা জাতিরও উপাস্য গুরু। নেপালের রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে (খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দী) গোরক্ষনাথ বা গোরখ্‌নাথ তথায় 'নাথ'—মত প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। নেপালের মুদ্রায় 'শ্রী গোরক্ষের' নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। (Encyclopaedia of Religion and Ethics, edited by J. Hastings, Vol. VI. PP. 328-330)

'নাথ'-পন্থী যোগীরা মনে করেন, এবং তৎসূত্রে সমগ্র সম্প্রদায়টির ধারণা জন্মিয়াছে যে, এই সংসারে 'যোগ' ও 'ভোগ' নামে দুইটি ব্যাপার বর্তমান। সংসারের সব কিছুই হয় 'যোগ' না হয় 'ভোগ'—এই দুইয়ের একটির অন্তর্গত; সিদ্ধাগণ 'যোগে' এবং সংসারিগণ 'ভোগে' মগ্ন থাকেন। উভয়ের ফলও পৃথক: যোগের ফল 'মুক্তি', ভোগের ফল 'বন্ধন'। 'যোগে' গোড়ায় কষ্ট হইলেও পরিশেষে 'পরমানন্দ' লাভ ঘটে এবং 'ভোগে' কিঞ্চিৎ সাময়িক 'বিষয়ানন্দ' মাত্রই পাওয়া যায়। অতএব, জীবনে যোগই একমাত্র কাম্য।

'নাথ'-সম্প্রদায় দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী নহেন। 'নাথ'-শব্দের অর্থ 'স্বামী' বা 'প্রভু'। এই জন্যই এই সম্প্রদায়ের গুরুরা 'গোস্বামী' ('আদ্য-পরিচয়ে' যাহাকে 'নিরঞ্জন গোসাঞি' বলা হইয়াছে) নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে, 'গো' বা গরুসমূহের 'স্বামী বা রক্ষক হইল 'গোস্বামী'। ইহা দেখা যাইবে,—যাহাই 'গোরক্ষ' তাহাই 'গোস্বামী'। বাল্য বয়সে 'গোরখনাথ' গরু চরাইতেন ও পালন করিতেন।

এই সম্প্রদায়ের 'নাথ' বা পরমেশ্বর বা নিরঞ্জন-গোসাঁই এমন এক সত্তা, যাহা সগুণ ও নির্গুণের অতীত। তাঁহার বামভাগে নির্গুণ ব্রহ্ম, দক্ষিণ ভাগে সগুণ ইচ্ছা-শক্তি এবং মধ্যভাগে তিনি স্বয়ং বিরাজমান। এই 'নাথ'-সত্তায় সগুণ ও নির্গুণ একত্রে সম্মিলিত। তাই তিনি সর্বতোপরিবর্তী, দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত, বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বোত্তীর্ণ এক সত্তা। নিজেকে এই 'নাথ'-স্বরূপে অনুভব করাই জীবনের লক্ষ্য। যোগজ প্রণালী দ্বারা সাধন না করিলে, এই অনুভূতি লাভ করা সম্ভবপর হয় না। ('নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী, শ্রীকল্যাণী মল্লিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৫০, পৃ ২৭২, ৩৫৭-৫৮)

বাংলাদেশে (অবিভক্ত সমগ্র বাংলাদেশে) সিদ্ধাচার্যদের প্রভাব অতি প্রাচীন, অন্ততঃ খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী। চর্যাপদ, দোহাকোষ প্রভৃতির আবিষ্কারে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রভাব স্তিমিত না হইয়া বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এই প্রভাব হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীরভাবে অনুভূত হয়। তাহার নিদর্শন শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ-বিজয়' (১৫৭০ খ্রী.), 'ময়নামতীর গান,' কানু ফকীরের (১৮শ শতাব্দী) 'আগম' প্রভৃতি পুস্তকের আবিষ্কারে মিলিতেছে। 'আদ্য-পরিচয়'-ও (১৪৯৮ খ্রী.) ইহার

নিদর্শনমালার মধ্যে অন্যতম। এই সমস্ত পুস্তককে গোরক্ষনাথের প্রভাব ও কাহিনী ওত-প্রোতভাবে বিজড়িত। বঙ্গীয় রাজা মানিক চন্দ্রের মহিষী ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। বাংলাদেশের গীতি-সাহিত্যের এক বিরাট অংশ গোরক্ষনাথ ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য ও সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

সম্পাদকের বক্তব্য

রাজশাহী শহরে অবস্থিত লোকনাথ হাই স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত শ্রী মনীন্দ্র মোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ মহোদয়ের সম্পাদনায়, 'রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়াম'-এর ব্যয়ে, ১৯৬৪ ইংরেজীতে শেখ জাহেদের 'আদ্য-পরিচয়' নামক পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি, ইহা আর একবার মৎকর্তৃক সম্পাদনের আবশ্যকতা অনুভূত হইল কেন, তাহা নিম্নে বলিতেছি :

ক. প্রথমতঃ, প্রাচীন পুঁথি, বিশেষ করিয়া 'আদ্য-পরিচয়ের' ন্যায় প্রাচীনগ্রন্থ যত বেশী সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়, ততই দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের জন্য মঙ্গল। ইহাতে বিভিন্ন বিদ্বান বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে টীকা-টিপ্পনী সংযোজনে সমর্থ হওয়ায়, পুস্তকের অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত তত্ত্বের অথবা তথ্যের উপর নূতন আলোকপাত সম্ভবপর হওয়ায়, পুস্তকের ভাষা ও বিষয়-বস্তু পাঠকের নিকট পরিস্ফুটতর হইয়া দেখা দিয়া থাকে।

খ. দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা মনীন্দ্র বাবুর সম্পাদিত পুঁথিখানি দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, তিনি তাঁহার ভূমিকার ৸৵ পৃষ্ঠায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে গিয়া আমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, এম.এ. পি-এইচ্.ডি. ··· গ্রন্থের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নানা উপদেশ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।' আমাকে তাঁহার 'শিক্ষক' বলিয়া প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়া লইয়া আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য মনীন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি তাঁহার স্কুল, কলেজ বা টোলের শিক্ষক নহি; বরং আমি তাঁহাকে রাজশাহী যাদুঘরের প্রাচীন বাংলা পুঁথি সম্পাদনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, পুঁথির ভাষার জট উন্মোচনে, হৃতপত্রের পুনরুদ্ধারে, আদর্শ পুঁথি-নির্ণয়ে, প্রাপ্ত পুঁথির পত্রস্থ শূন্যস্থান পূরণে, নিরর্থক শব্দকে অর্থবহ, অর্থহীন অশুদ্ধ শব্দকে অর্থবান ও শুদ্ধ করিয়া তোলায় এবং তথ্য ও তত্ত্ব-উদ্ধারে সাহায্য করিয়া 'আদ্য-পরিচয়' পুস্তকের সম্পাদন-কার্য পরিচালিত করিতে-ছিলাম। যিনি তৎসম্পাদিত পুঁথিখানি নিবিষ্ট মনে টীকা-টিপ্পনীসহ পাঠ করিয়াছেন বা করিবেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, ইহার সম্পাদনায় আমার হাত কতখানি সুস্পষ্ট। এতৎসত্ত্বেও, সম্পাদিত পুঁথিখানিতে ত্রুটির অভাব নাই। যখনই আমি ইহা দেখি, তখন ইহা আমাকে পীড়া দেয়। কি কারণে এমনটি হইল, পরবর্তী অনুচ্ছেদে তাহার আঁচ পাওয়া যাইবে।

গ. তৃতীয়তঃ, এই জাতীয় পুস্তক সম্পাদন খুব সহজসাধ্য কাজ নহে। এমন কি, হাজার ইচ্ছা করিলেও অল্পদিনে বা কোন নির্দিষ্ট দিনে এই কাজ সন্তোষজনক-ভাবে শেষ করা যায় না; কারণ বাধা অনেক,—তথ্যগত, তত্ত্বগত, ব্যক্তিগত, অর্থ-নীতিগত, বিদ্যাবুদ্ধিগত ইত্যাদি। মনীন্দ্র বাবু ও আমি যদিও রাজশাহীতে খুব কাছাকাছি বাস করিতাম, তথাপি কাজ শেষ না হইতেই, আমাকে কর্তব্যব্যপদেশে রাজশাহী ত্যাগ করিতে হয়। ১৯৬৩ ইংরেজীতে আমি রাজশাহী ত্যাগ করি। মনীন্দ্র বাবু হতাশ হইয়া পড়েন। কাজটি যতটুকু করা হইয়াছিল, ততটুকু সম্বল করিয়া অনন্যোপায় অবস্থায়

তাড়াহুড়া করিয়া ১৯৬৪ সালে তিনি ইহা প্রকাশ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং, পুঁথিটির একটি উন্নততর সম্পাদিত সংস্করণের আবশ্যকতা ইহার প্রকাশনার মধ্যেই সুপ্ত ছিল। আমি সেই সুযোগটুকুই গ্রহণ করিলাম।

ঘ. 'আদ্য-পরিচয়ের' (১৪৯৮) আবিষ্কার-সময় ও বিষয়-বস্তু এই উভয় দিক হইতে আমার নিকট শুধু প্রয়োজনীয় একটি সাহিত্যিক উপাদান নহে, বরং একটি চমকপ্রদ ঘটনাও বটে। মৌলিক গবেষণানির্ভর মুসলিম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস আমিই সর্বপ্রথম রচনা করি। তখন দেশে 'ভাষা-আন্দোলন'-কে দমাইবার জন্য 'বাংলা একটি হিন্দুর ভাষা,—ইহা মুসলমানের ভাষা নহে'—এমন একটি মিথ্যা প্রচারণা প্রায় অর্ধযুগ (১৯৪৮-১৯৫৪) ধরিয়া খুব জোরে চলিতেছিল। তখন পর্যন্ত পশ্চিম-বঙ্গের মুসলমানের এত প্রাচীন (১৪৯৮) বাংলা রচনা সম্বন্ধে আমি সম্যক অবগত ছিলাম না। আমার 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য'-কে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার জন্য 'আদ্য-পরিচয়ের' আবিষ্কার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। এতদ্ব্যতীত, ইহার বিষয়-বস্তুও আমার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী। আমি যখন সূফীমতবাদের বঙ্গীয় সংস্করণের ইতিহাস রচনা করি, তখন পর্যন্ত এমন কোন পশ্চিম-বঙ্গীয় বাংলা উপাদানের সন্ধান লাভ করি নাই। এখন দেখিতেছি, আলোচ্য চিন্তাধারার 'আদ্য-পরিচয়' সত্যই এক অদ্ভুত পুস্তক।

উক্ত কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া, বিগত কয়েক বৎসর হইতে 'আদ্য-পরিচয়' পুস্তকখানির আর একটি সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। এইবার সেই ইচ্ছা রূপ গ্রহণ করিল। আশা করি, ইহাতে ভবিষ্যতের উন্নতর সংস্করণের কাজ আরও এক ধাপ আগাইয়া যাইবে। ইতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা-বিভাগ
মে, ১৯৭৯

নিবেদক
মুহম্মদ এনামুল হক

আদ্য-পরিচয়

শেখ জাহেদ (জীবিত ১৪৯৮ খ্রী.)

শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ। শ্রী ইলাহি আলাগিন। শ্রী গণেশায় নমঃ। শ্রী গুরুর চরণে নমঃ। শ্রী শ্রী মাতাপিতার চরণাভ্যাম্॥ দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু নমঃ।

গৌরচন্দ্রিকা

সাবধান হৈআ লোকে সুনহ মন করি[১]।
কহিমু[২] হিত কথা চিত্তি[৩] অনুসারি[৪]॥
গর্ভতন্ত্র যোগতন্ত্র সিদ্ধের কাহিনী[৫]।
বুঝিলে মুকতি হএ সুনিতে মধুর বাণী॥

---

১. এই চরণে প্রত্যেকটি শব্দ বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন 'সাবধান'। ইহা গঠনে { স (সহিত)+অবধান (প্রণিধান, মনোযোগ)=সাবধান (মনোযোগ বা প্রণিধান পূর্বক) } তৎসম শব্দ হইলেও, যে-অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বাংলা। ইহার ব্যবহারিক অর্থ 'সতর্ক' হইয়া। 'হৈআ'=সং. √ভূ=বাং. √হ+ইআ (অ+ই=ঐ)=হৈআ। 'লোকে' শব্দ কর্তৃকারকের রূপ নহে; ইহা সম্বোধন পদের রূপ 'হে লোকসকল'=সং. ভো লোকাঃ>হে লোকে { (ভো>হো>হে)+বহুবচনে 'লোকাঃ'>লোকা>লোকে) }। লক্ষণীয়—সং.—আঃ>প্রা.-আ>অপ.-আ>বাং.-এ। 'সুনহ' ইহা মধ্যম পুরুষের বহুবচনের পদ; ইহার অর্থ হইল—(হে লোকসকল!) তোমরা শুন। ইহার উৎপত্তি এইরূপ,—সং. √শ্রু=প্রা. √সুন্, তুল. হিন্দী √সুন্; মধ্যম পুরুষের বহুবচনে √সুন্+থ=সুনথ>সুনহ। 'মন করি'=মনদিয়া। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার তৃতীয়া বিভক্তির স্থলে বর্তমানে 'দিয়া' অনুসর্গ ব্যবহৃত হইতেছে: ইহা যেন সংস্কৃত 'মনস্' শব্দের তৃতীয়ায় (করণ কারকে) 'মনসা' স্থলে 'মনঃকৃত' রূপ ধারণ করিয়া মধ্যযুগের বাংলায় 'মন করি' রূপে পরিণত হইয়াছিল।

২. কহিমু=মুঞি কহিমু (আমি কহিব), উত্তম পুরুষ, ভবিষ্যৎ, একবচন।

৩. চিত্তি—ইহা তৎসম 'চিত্ত' শব্দের অর্থতৎসম রূপ নহে। এখানে শব্দান্ত্য 'ই'='এ' এই 'এ' সংস্কৃতের তৃতীয়া বিভক্তির-'এন' (চিত্তেন)>এঁ>এ=ই। ইহার অর্থ 'চিত্তযোগে,' 'চিত্তদ্বারা'।

৪. অনুসারি—অনুস্মারি (নামধাতু)। অনু (পশ্চাৎ)+স্মার (স্মরণ)=অনুস্মার

৫. গর্ভতন্ত্র, যোগতন্ত্র, সিদ্ধাতন্ত্র—ভূমিকার পৃ. ২২-২৮ দ্রষ্টব্য।

আউটি বিচার[৬] জেবা জানিব[৭] নিশ্চএ।
গেআন কম্মেত[৮] তাক[৯] সন্দেহ নাঞি রএ[১০]॥
গেআন জন্মিব জেবা করিব ধেআন।
ধেআন না কৈলে তার কিবা (হৈব) গেআন॥

'গর্ভতন্ত্র'—যে-তন্ত্র বা শাস্ত্রের সাহায্যে দেহের উৎপত্তি ও বিলুপ্তির রহস্য অবগত হওয়া যায় কিংবা গর্ভে ভ্রূণের উদ্ভব, বিকাশ ও জন্ম হয় এবং পরে সংসার ধর্মপালন করিয়া মানুষ মরিয়া যায়, তাহাকে গর্ভতন্ত্র বলে।

'যোগতন্ত্র'—পতঞ্জলি নামক মুনি বিরচিত শাস্ত্রের নাম 'যোগশাস্ত্র'। (ভূমিকার পৃ. ২৩-২৪ দ্রষ্টব্য)

'সিদ্ধের কাহিনী'—বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধ পুরুষকে 'সিদ্ধা' বলে। এখানে 'কাহিনী' শব্দের অর্থ 'বিবরণ' হইলেও 'সিদ্ধের কাহিনী' কথার অর্থ 'সিদ্ধাই' বা সিদ্ধত্বলাভের বিবরণ; অন্য কথায় 'সিদ্ধাতত্ত্ব'।

৬. আউটি বিচার—ইহা একটা পারিভাষিক কথা; ইহার অর্থ—দেহতত্ত্ব-নির্ণয়। মূল শব্দ 'আউট'-এর সহিত বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপনার্থে '-ই' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'আউটি' গঠিত। এই 'আউট' শব্দটি ভাষার প্রাচীনতাদ্যোতক: শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে 'সাড়ে তিন' অর্থে "আহুঠ হাথ" কথাটির ব্যবহার দেখা যায়; শ্রীকৃষ্ণ বিজয়েও "আউট হাত প্রমাণ আমার কলেবর" দেখিতে পাই। এই 'আহুঠ' বা 'আউট' শব্দটি সংস্কৃত 'অর্ধ-চতুর্থ' বা 'আধ কম চার' অর্থাৎ সাড়ে তিন কথা হইতে উৎপন্ন। ইহার বিবর্তন-ধারা এইরূপ:
সং. > অর্ধ-চতুর্থ > অড্ঢ অউট্ঠ > আঢ অউঠ > আহউঠ > আহুঠ > আহুট > আউট।
পারিভাষিক অর্থে ইহাকে দেহের অর্থে গ্রহণ করিবার কারণ সম্ভবতঃ এই, —যেহেতু মানুষের দেহ তাহার নিজের হাতের মাপে 'সাড়ে তিন হাত,' সেহেতু "আউটি বিচার"-এর অর্থ 'দেহতত্ত্ব নির্ণয়'।

৭. জানিব—সং. √জ্ঞা = বাং. √জান এর অন্তে ভবিষ্যৎকাল, নামপুরুষ, এক বচনের আধুনিক তিঙ্ 'ইবে' স্থলে প্রাচীনতর তিঙ্-'ইব' এর ব্যবহার লক্ষণীয়। বঙ্গদেশের ঢাকা-মৈমনসিংহ অঞ্চলে এখনও আঞ্চলিক 'হে খাইব, হে যাইব' ইত্যাদি প্রাচীনতর রূপ প্রচলিত।

৮. কম্মেত = কর্মেতে অর্থাৎ সৎকাজে, সৎকর্মে। শব্দটিতে মধ্য বাংলার 'অধিকরণের লক্ষণ' '-এত' সুস্পষ্ট। সুতরাং, শব্দটি গঠনে কর্ম > কম্ম + এত = কম্মেত।

৯. তাক (সন্দেহ নাঞি রএ = তাহার সন্দেহ থাকে না) = তাক কর্ম কারকের পদ নহে, সম্বন্ধ পদের একটি রূপ। ইহার গঠন:
সংস্কৃত 'তস্য + কৃত'। তস্য > তস্স > তাস > তাহ > তাঅ > তা + ক < কঅ < কত < কৃত।

১০. রএ = রহে; সং. √রম্ = বাং. √রহ্ + তি = রহতি > রহই > রহএ > রএ।

দান ধেআন জেবা করএ সমরস[১১]।
যোগতন্ত্র সিদ্ধাতন্ত্র[১২] রাখে সব বশ॥
লোহ[১৩] মোহ কাম ক্রোধ কিছু করিতে না পারে।
আপনি অনুগ্রহ তারে করেন করতারে[১৪]॥

গর্ভের বিচার জানিলে বাটিব রঙ্গ[১৫]।
জেন মতে সৃষ্ট হএ মনুষ্যের অঙ্গ॥

---

১১. সমরস—ইহা ভারতীয় যোগশাস্ত্রের একটা পারিভাষিক শব্দ। সতের ও তেতাল্লিশ সংখ্যক 'চর্যাপদে' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'দোহাকোষে'-ও ইহার উল্লেখ আছে, যথা—'তত্তই সমরস হোই (১৩২)'। যৌগিক পরিভাষায় ইহা 'শূন্যতা ও করুণার অভেদমিল' অথবা 'ভাবাভাববিবর্জিত সহজ অবস্থা'। যোগমার্গগামী সাধক (যোগী) যখন সাধনা বলে 'পরতত্ত্বে' উপনীত হন, তখন তিনি 'তাদাত্ম্য' (তৎ+আত্মন্=তদাত্মন্+ষ্ণ্য=তাদাত্ম্য) অর্থাৎ ভেদাভেদ তিরোহিত অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহা সাধকের 'লোকা ন লোকা, বেদা ন বেদা, দেশা ন দেশা, যজ্ঞা ন যজ্ঞা, মাতা ন মাতা, পিতা ন পিতা,—তাপসা ন তাপসা ইতি একমেব পরম্' এমন একটি অবস্থা। অর্থাৎ সাধকের সহিত পরম-ব্রহ্মের একাত্মতার অবস্থা।

১২. যোগতন্ত্র, সিদ্ধাতন্ত্র—পূর্বপৃষ্ঠা ও ভূমিকার ২৩-২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৩. লোহ—সংস্কৃত 'লোভ' শব্দের প্রাকৃত রূপ 'লোহ' লক্ষণীয়। শূন্যপুরাণেও দেখা যায়,—''লোহ মোহ কাম ক্রোধ দূরত তেআগিঅ।'' শব্দটি 'আদ্য-পরিচয়ের' ভাষার মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক।

১৪. করতার—মধ্যযুগের মুসলমানদের মধ্যে 'আল্লার' পরিবর্তে বাংলায় 'করতার' শব্দের ব্যবহার সমধিক দৃষ্ট হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'ঈশ্বর', 'ধর্মঠাকুর' প্রভৃতি অর্থে কোন কোন হিন্দু লেখকের মধ্যেও শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়, যথা—'তোমারে সদয় না হইল করতার' (ঘনরামের ধর্মমঙ্গল)। মনে হয়, মুসলমানদের কাছ হইতেই হিন্দু লেখকগণ এই শব্দটি ব্যবহার করেন। কারণ—আরবী 'রব্' বা 'প্রভু' শব্দের পরিবর্তেই 'করতার' শব্দটি মুসলমান লেখকগণ বাংলায় ব্যবহার করিতেন। অর্থের দিক হইতে বিবেচনা করিলে আরবী 'রব্' শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'কর্তা' {√কৃ (করা)+তৃচ্(তৃ), কর্তৃ বাচ্যে=কর্তৃ>কর্তা} অন্য কোন শব্দ দ্বারা এত ভালভাবে প্রকাশ করা যায় না। সম্ভবতঃ এই কারণেই 'কর্তৃ' শব্দ হইতে প্রথমার একবচনে 'কর্তা' এবং বহুবচনে 'কর্তারঃ' স্বরভক্তিতে 'করতার' পদ গঠিত হইয়াছে। গৌরবার্থে 'রব' শব্দের এক বচনের স্থলে বহুবচনের পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

১৫. রঙ্গ—ইহা সংস্কৃত 'রঙ্গ' (√রন্জ্+ঘঞ্, ণ-বাচ্যে) 'রঞ্জক দ্রব্য' অর্থে ব্যবহৃত শব্দ নহে। শব্দটি ফার্সী 'রন্গ' (رنگ) এবং মূল অর্থ—'কৌতুক,' তামাশা (تماشه) অর্থেই এখানে ব্যবহৃত।

মায়ের জতেক দ্রব্য পিতার জত ধন[১৬]।
অনাদ্য ধম্মের[১৭] জত[১৮] বৈসএ[১৯] রতন ॥

বাত[২০] বরুণ আনল বৈসে জেই জেই খানে[২১]।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কহিমু স্থানে স্থানে ॥
চান্দ সুজ্জো[২২] আকাশে জত তারা সাজে।
তুলনা দিমু সব শরীরের মাঝে ॥
নদ নদী আর গঙ্গা ভাগীরথী।
শরীরের মাঝে ঢেউ বহিছে দিবারাতি ॥

---

১৬. মায়ের . . . ধন—এই বাক্যের দুইটি অংশ, যথা—(ক) 'মায়ের জতেক দ্রব্য', (খ) 'পিতার জত ধন'। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে দেখা যায়,—

"মায়ের চারি দ্রব্য পিতার চারিধন।
অনাদ্য ধম্মের জত বৈসএ রতন॥" আরও পরে পুস্তকে

এই সমস্ত দ্রব্যের হিসাব দেওয়া আছে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলিতে হয়, মায়ের যত দ্রব্য তাহার সংখ্যা চার, যথা—'মাংস, চর্ম, লোম, রক্ত' এবং পিতার যত দ্রব্য তাহার সংখ্যাও চার, যথা—'অস্থি, মজ্জা, শিরা, বীর্য'। অধিকন্তু, 'অনাদ্য ধর্মের' অর্থাৎ করতার-প্রদত্ত রত্নের সংখ্যা দশ, যথা—'বাক্‌শক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ঈমান, বুদ্ধি, চৈতন্য, আয়ুঃ, আত্মা বা রুহ্, শরীর'। এই পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৭. অনাদ্য ধম্ম—অনাদ্য ধর্ম; ইহার অর্থ হইতেছে, যে-ধর্মঠাকুর বা ধর্মদেবতা আদিবিহীন অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ। তুলনীয়:

বন্দি পরাৎপর ব্রহ্ম, অনাদি অনন্ত ধর্ম,
বিশ্বরাজ অখিল আধান।
সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন, নির্বিকার নিরঞ্জন,
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধান॥
(ধর্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্তী)

আলোচ্য পুস্তকে 'ধর্ম' শব্দ প্রায় সর্বত্র 'ধম্ম'রূপে লিখিত। বলাবাহুল্য 'ধর্ম' শব্দের পালি ও প্রাকৃত রূপ 'ধম্ম'।

১৮. জত—'জত' অন্যত্র 'জথ'রূপেও পাওয়া যায়। সুতরাং জত=জথ—আধু. 'যত'। ব্যুৎপত্তি: যৎ+-তক (কল্পিত)=যত্তক>জত্তঅ>জত=যত (আধু.)

১৯. বৈসএ—বসে। শব্দটির উৎপত্তি এইরূপ:

সং. উপবিশতি>প্রা. উবইসই>বইসই>বৈসএ>বৈসে>বসে।

২০. বাত—শব্দটি হিন্দী 'বাত' {<বাতা<বাত্তা<বার্তা(সং.)} নহে। ইহা ফার্‌সী 'বাদ' (১৮) শব্দ এবং ইহার অর্থ—বাতাস, বায়ু।

২১. খান—স্থান (সংস্কৃত শব্দাদ্য 'স্থ'-সংযুক্ত ধ্বনি বাংলায় 'খ'-ধ্বনিতে যেমন 'স্থান'> খান অথবা 'থ'-ধ্বনিতে 'কালীর স্থান'>'কালীর থান' পরিণত হইয়াছে)।

২২. চান্দ সুজ্জো—চন্দ্র সূর্য। সং. চন্দ্র>চান্দ>চাঁদ এবং সং. সূর্য>সুজ্জো, সুরুজ (অর্ধ-তৎসম রূপ)। মহাশূন্যে যেমন চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রাদি বর্তমান, মানবদেহেও সেইরূপ তাহাদের অস্তিত্ব বর্তমান। ইহা যোগ সাধকেরা বিশ্বাস করেন।

কিঞ্চিৎ কহিমু তাহা গুরুর উপদেশ।
তাহার প্রসাদে মুঞি জানিলুঁ[২৩] বিশেষ ॥
আদ্য অনাদ্য[২৪] গুরু কহিল শ্রবণে[২৫]।
সেই হৈতে মোর জনমিল গেআনে[২৬] ॥

কহিল সকল কথা হৃদয়ে উতারি[২৭]।
কিঞ্চিত কহিমু সেই কথা অনুসারি[২৮] ॥
ব্রহ্মার আনন জত রাবনের করে।
গুনিলে জত হয়ে (হএ) সহস্র উপরে ॥
এত সাকের (লোকের?) মাঝে করিল প্রচারে। } [২৯]
পয়ার প্রবন্ধে[৩০] কহি আঁতুমা বিচারে ॥

---

২৩. মুঞি জানিলুঁ—আমি জানিলাম। (উত্তর বঙ্গে)—মুই জানলু। মুই(মুঞি) একবচনের রূপ; ইহার উৎপত্তি সং. ময়া=*ময়েন>মএঁ>মুঁই>মুঞি>মুই। বহু বচনের রূপ 'আহ্মি জানিল'; সং. অস্মাভিঃ>*আম্হহিঁ>*আমহই>আমহে, আহ্মে>আহ্মি>আমি।

২৪/২৫. 'আদ্য অনাদ্য গুরু কহিল শ্রবণে'—গুরুদেব আদ্য ও অনাদ্য কথা কানে-কানে বলিয়াছেন। এখানে 'নাথ' সম্প্রদায়ের আদি গুরু 'আদিনাথ' নহে, কিংবা প্রাক্‌সৃষ্টির অনাদ্য 'গোসাঞি নিরঞ্জন' নহে। বরং এইখানে 'আদ্য' এবং 'অনাদ্য' শব্দের দ্বারা 'সৃষ্টির আদি বা প্রাথমিক রহস্য' এবং 'প্রাক্‌সৃষ্টি রহস্য' বুঝানো হইয়াছে। এই দ্বিবিধ রহস্য-তত্ত্ব শেখ জাহেদের গুরু তাহাকে গোপনে কানে কানে বলিয়া দিয়াছেন। কারণ এই বিদ্যা বা তত্ত্ব গুরুমুখী বিদ্যা।

২৬. গেআনে—এই পুস্তকে 'জ্ঞান' শব্দের বানান সর্বত্র 'গেআন'। 'গেআনে জনমিল' =জ্ঞান জন্মিল; কর্তৃকারকে '-এ' বিভক্তি লক্ষণীয়। তুলনীয়. 'মানুষকে ভূতে পাএ'; 'আগুনে বন পোড়ে, চিন্তায় পোড়ে মন।'

২৭. হৃদয়ে উতারি—লক্ষণীয় বিষয় হইল, 'হৃদয়ে' অপাদান কারকে '-এ' বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ 'হৃদয় হইতে'। 'উতারি' শব্দ 'উতার' ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ। ইহার অর্থ, অবতারণ করাইয়া; উঠাইয়া, খুলিয়া ইত্যাদি। তুল. হিন্দী—উতার্‌না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'উঠাইয়া', 'খুলিয়া' অর্থে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন—'সেই আবরণ দেখরে উতারিয়া, মুগ্ধ সে মুখখানি।'

২৮. অনুসারি—পূর্বালোচনা দ্রষ্টব্য।

২৯. এই তিন চরণে হেঁয়ালিতে পুস্তক রচনার তারিখ দেওয়া হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে ইহা এইরূপ:

ব্রহ্মার আনন=চতুর্মুখ ব্রহ্মা—৪
রাবণের কর=দশমুণ্ড রাবণের কুড়িখানা হাত—২০
তাহা হইলে হইল—৪২০; তাহার উপরে এক হাজার ১৪২০
শকাব্দ+৭৮=১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দ

টীকা: 'সাকের' শব্দ পাণ্ডুলিপিতে 'লোকের' অর্থহীন। ইহা দৃশ্যতঃ অনুলিখকের ভুল। তাঁহার 'ল', 'ন' এবং 'স' লেখায় অনেকটা অনুরূপ।

(শেখ) জাহেদ কহে চিত্তি করি সার[৩১]।
সুহৃদ[৩২] চরণ বিনে গতি নাঞি আর ॥

(ইতি—গৌরচন্দ্রিকা সমাপ্ত)

বিশেষতঃ তখনকার দিনে অশুদ্ধ হইলে কাটিয়া শুদ্ধ করার রীতিও প্রায় দেখা যায় না।

৩০. পয়ার প্রবন্ধ—পয়ার+প্রবন্ধ=পয়ার নামক ছন্দের কৌশল। পয়ার—পদ(শ্লোকের 'চরণ')+কার (যে করে)=সং. পদকার>পঅআর>পয়আর>পয়ার—বর্তমান 'অক্ষরবৃত্ত ছন্দের' একটা রূপ।

প্রবন্ধ—সং. প্র+√বন্ধ্ (বন্ধন করা, বাঁধা)+ঘঞ্(অ). ভা=রচনা, সন্দর্ভ, সংগ্রহ প্রভৃতি মৌলিক অর্থ হইলেও, মধ্যযুগে শব্দটির অর্থ ছিল 'কৌশল', 'উপায়'; যেমন—'এ সব কাজের আন্ধে জানিল প্রবন্ধ' (কৃষ্ণ কীর্তন)।

৩১. এই চরণটিতে 'জাহেদ' (জাহিদ)-ভণিতায় 'শেখ' মূলে নাই; অথচ চরণটির মাত্রা অত্যন্ত কম। 'শেখ' বসাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও পয়ারের প্রথম চরণের মাত্রা পূর্ণ হয় নাই। মধ্যযুগে এইরূপ অপূর্ণ মাত্রার পয়ার অনেক দেখা যায়।

৩২. সুহৃদ—শব্দটি এখানে বিশেষ তাৎপর্যবহ। তাহা এইরূপ: সু (শোভন) হইয়াছে হৃৎ (হৃদয়) যাহার, সেই ব্যক্তি। অতএব, শব্দটি 'বহুব্রীহি সমাসে' গঠিত এবং ইহাকে প্রায়ই 'বন্ধু', 'মিত্র', 'সখা' শব্দের সমার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু, ইহা ঠিক নহে; কারণ এক শব্দের তাৎপর্য অন্য শব্দের তাৎপর্য হইতে পৃথক্। এই পার্থক্য নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িতেছে:

অত্যাগসহনো বন্ধুঃ, সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং, সমপ্রাণঃ সখা মতঃ॥

অর্থাৎ

যাহাকে ত্যাগ করা যায় না (যেমন আত্মীয়-কুটুম্বাদি), তিনি 'বন্ধু'; যিনি সর্বদা প্রণয়াস্পদের অনুমত (অর্থাৎ আজ্ঞাবহ) থাকেন, তিনি 'সুহৃৎ'; যাঁহাদের ক্রিয়া একবিধ, তাঁহারা 'মিত্র'; এবং যে দুইজন একে অপরকে প্রাণতুল্য মনে করেন, তাঁহারা 'সখা'।

এই আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, শেখ জাহেদ তাঁহার 'পীরের চরণ' ধ্যান করিতে গিয়া 'সুহৃদ্-চরণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'পীরের চরণকে' সুহৃদ্-চরণ বলিবার কারণ এই:

'মুরীদ' বা শিষ্যকে সর্বদাই 'পীর' বা গুরুর আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে হয়। পীর যাহা বলেন, মুরীদকে তাহা নির্বিবাদে পালন করিতে হয়। ইহা 'পীর-মুরীদীর' একটা মৌলিক শর্ত। এই শর্তটি গুরুবাদেও দেখা যায়। 'মারফা' বা অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে 'সালিক' বা অধ্যাত্ম-পথযাত্রী শিষ্যকে 'পীরের' আজ্ঞাবহ হইতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে হাফিজের (১৩১৪-১৩৮৯) বিখ্যাত চরণদ্বয় স্মর্তব্য:

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টিতত্ত্ব[১]

॥ দীর্ঘ ছন্দ ॥

শ্রী গান্ধার রাগ

ন ছিল খিতিজল ই[২] মহীমণ্ডল[৩]
শূন্য[৪] মধ্যে ন ছিল প্রকাশ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সব ছিল অন্ধকার
আউর[৫] ন ছিল আকাশ ॥

بمی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بیخبر نبود زراه ورسم منزلها+

[যদি সিদ্ধপীর বলেন, জায়নমাজকেও মদ দিয়া রাঙাইয়া দাও; যেন লক্ষ্যে পৌঁছাইবার অলিগলি সম্বন্ধে শিষ্য অনবহিত না থাকে।] শিষ্য গুরুর এইরূপ 'অনুমত' বা আজ্ঞাবহ বলিয়াই, শেখ জাহেদ গুরুকে 'সুহৃৎ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

১. শেখ জাহেদের এই 'সৃষ্টিতত্ত্ব' রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণের' সৃষ্টিতত্ত্বের বেশ কিছুটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। কৌতূহলী পাঠক 'শূন্যপুরাণের' সৃষ্টিতত্ত্ব অংশের সহিত 'আদ্য-পরিচয়ের' এই অংশ মিলাইয়া পড়িয়া দেখিতে পারেন; যেমন—

'নহি রেখ নহি রূপ নহি ছিল বর্ন চিন।
রবি সশী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥' (শূন্যপুরাণ)

অধিকন্তু, এই সৃষ্টিতত্ত্বের শেষের দিকে দেবাসুর সৃষ্টির সহিত মনুষ্য সৃষ্টির ধারণাও স্থান পাইয়াছে।

২. ই—সং. ইদম্>ইঅং>ইঅ>ই=এই।

৩. মহীমণ্ডল—মহী(পৃথিবী)+মণ্ডল(বলয়)মহীমণ্ডল—পৃথ্বিমণ্ডল। আধুনিক জ্যোতি-বিদ্যা মতে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়াই যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ মহাশূন্যে

চন্দ সুজ্জো তারা　　ন ছিল অভিপরা[৬]
ন ছিল নবীন জলধর।
বাউ[৭] বরুণ আনল　　পৃথিবী রসাতল[৮]
ন ছিল পর্বত শিখর॥
নদ নদী শূন্যাকার　　ন ছিল ঝোর[৯] ঝংকার
ন ছিল সাগর তিখ স্থান।
সংসারে ন ছিল কিছু　　সব হৈল তার পিছু
সবে মাত্র ছিল ভগবান[১১]॥

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার নাম 'সৌরমণ্ডল'। পূর্বে পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্র সূর্য ও গ্রহাদি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত।

৪. শূন্য—ভারতীয় দর্শনে 'শূন্যতত্ত্ব' বড় প্রাচীন ও জটিল। যোগে, তন্ত্রে, বৌদ্ধ ও জৈন মতে,—সর্বত্র 'শূন্য'-তত্ত্বের উল্লেখ ও পন্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সংজ্ঞা সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নাই। এতৎসত্ত্বেও বলিতে পারা যায়—চিত্তকে বৃত্তিহীন করিয়া তোলাই 'শূন্যতত্ত্বের' লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে যোগসাধনের কয়েকটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়। আমার ধারণা,—সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র নিরঞ্জন আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না; সেই-অবস্থার নাম 'শূন্য'।

৫. আউর—আর; সং. অপর>অবর>আওর>ঔর=বাং. আর।

৬. অভিপরা—ইচ্ছা, বাসনা। সং. অভিপ্রায় (স্বরভক্তিতে)>অভিপরায়>অভিপরা। এখানে শব্দটির অর্থ হইল, সৃষ্টির ইচ্ছা বা বাসনা।

৭. বাউ—সং. বায়ু>বাউ=বাতাস

৮. রসাতল—লক্ষণীয়: ইতঃপূর্বে 'পাতাল' শব্দের উল্লেখ আছে। জনসাধারণের বিশ্বাস,—'রসাতল' শব্দের অর্থ 'পাতাল'। তাহা হইলে আবার এখানে 'রসাতল' বলার তাৎপর্য কি? হিন্দুদের বিশ্বাস 'অধোভুবন' বা 'পাতাল' পর্যায়ক্রমে সাতটি, যথা (১) অতল, (২) বিতল, (৩) সুতল, (৪) তলাতল, (৫) মহাতল, (৬) পাতাল, (৭) রসাতল।

৯. ঝার-ঝঙ্কার—ঝোর, ঝর, 'ঝার' শব্দের অর্থ—পর্বতের গা বহিয়া প্রবাহিত জল-প্রবাহ (অমরকোষ)। এই জল প্রবাহের ঝঙ্কার অর্থাৎ পার্বত্য নির্ঝরিণীজাত জলপ্রপাতের শব্দ। মূলে শব্দটি 'ঝার'; 'ঝোড়' নহে।

১০. তিখস্থান—সং. তীর্থস্থান। 'তিখ' প্রাকৃতের রূপ।

১১. ভগবান—এই 'ভগবান' দ্বারা 'প্রভু নিরঞ্জন' বা নাথ-সম্প্রদায়ের 'নাথ'-কেই বুঝাইতেছে। এই 'ভগবান' সগুণ ও নির্গুণাতীত এবং এক সর্বোত্তীর্ণ সত্তা; মুসলমানেরা যাঁহার কথা বলিতে গিয়া বলিয়া থাকেন, 'আল্লাহুস্ সমদ্' = الله الصمد।

একা ছিল নিজ রূপ[১২] কিছু না পাইল সুখ[১৩]
ভাবিল প্রভু আপন শরীরে[১৪]।
শূন্যাকার ঘুচাই দৃষ্টি[১৫] রচিলা ত নানা সৃষ্টি[১৬]
এক খেলা খেলাইব সংসারে[১৭] ॥
আপনার দিয়া রতি[১৮] নিজে লএ এক মূর্তি[১৯]
রাখিলা গোসাঞি[২০] অলঙ্ঘ্য সাগরে[২১]।

---

১২. নিজ রূপ—নিজের আকৃতি (রূপ)। ভগবান বা নিরঞ্জন গোসাঞি-এর কোন রূপ নাই। সুতরাং 'রূপ' বা আকৃতির দ্বারা অস্তিত্ব বুঝানো হইয়াছে। তিনি নিজের অদৃশ্য সত্তায় একা ছিলেন অর্থাৎ শুধু তাঁহার সত্তাটুকুই ছিল।

১৩. কিছু না পাইল সুখ—কেবল অদৃশ্য সত্তাটুকু লইয়া নিরঞ্জনের কোন সুখ অনুভূত হয় নাই। (সেই জন্য)—

১৪. ভাবিল...শরীরে—সেই জন্য তিনি নিজের শরীর ধারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিলেন। চিন্তা মাত্রই তিনি শরীর ধারণ করিলেন। (ফলে—)

১৫. শূন্যাকার ঘুচাই দৃষ্টি—তিনি তাঁহার 'শূন্যাকার' (শূন্য+আকার) অর্থাৎ অপরূপ-সত্তা অপনীত করিয়া (ঘুচাইয়া) নিজেকে সকলের দৃষ্টিগোচর করিলেন। এবং—

১৬. রচিলা ত নানা সৃষ্টি—নিখিল বিশ্ব রচনা করিয়া তাহাতে নানাবিধ বস্তু সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর—

১৭. এক খেলা ----সংসারে—সংসারে এক খেলা 'খেলাইবার' ('খেলিবার' নহে) ইচ্ছা পোষণ করিলেন। প্রশ্ন হইল,—কাহাকে দিয়া সদ্য রূপধারী অরূপ-সত্তাটি এই খেলা খেলাইবেন? এবং তিনি তাহা দেখিয়া উপভোগ করিবেন? বলাবাহুল্য, এই ব্যাপারে তাঁহার ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ই যথেষ্ট; অন্য কিছুর আবশ্যক নাই। দর্শনের ভাষায়, এই খেলার নাম 'ব্রহ্মখেলা'। পরম ব্রহ্মের লীলাময় অস্তিত্ব প্রকাশের জন্যই তিনি সৃষ্টিরূপ এক বিচিত্র খেলার আয়োজন করিতে অভিলাষী হন। এই খেলার জন্যই অরূপকে (নির্গুণকে) স্বরূপ (সগুণ) হইতে হয়। তাই, অরূপ স্বরূপ হইবার ইচ্ছা পোষণ করিলেন। সেই ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে কার্যেও পরিণত হইল।

১৮. রতি—আসক্তি, অনুরাগ। সং. রক্তি>রত্তি>'রাতি' স্থলে 'রতি' হইয়াছে। ইহাতে শব্দটি 'রাত্রি' অর্থে 'রাতি' হইতে পৃথক্ হইয়াছে।

১৯. মূর্তি—এখানে 'মূর্তি' অর্থে 'প্রতিমা' নহে। বরং ইহার অর্থ এক অপূর্ব অচিন্তনীয় রূপ; অদৃশ্যও বলিতে পারা যায়। 'নিজে লএ'—তিনি নিজে নিজেই এক মূর্তি ধরিয়া (লইয়া)।

২০. গোসাঞি—ইহার অর্থ 'নিরঞ্জন গোসাঁই' বা নিরঞ্জন প্রভু। সং. গোস্বামী>>গোসাবঁী>গোসাঞি (আধু.) গোসাঁই।

১৮/১৯/২০=প্রভু নিরঞ্জন আপন আসক্তি-বসে স্বয়ং এক অপূর্ব রূপ ধারণ করিয়া লইয়া এক অলঙ্ঘ্য অর্থাৎ অনন্ত সাগরে নিজেকে রাখিলেন অর্থাৎ স্থাপন করিলেন।

মিত্ত[২২] সঙ্গে আলাপনে কৌতুক বাড়িল মনে
　　নির্মাইল একহি হুঙ্কারে[২৩] ॥
সৃজন করিআ মিত্ত　হরিষ[২৪] বাড়িল চিত্ত
　　জলের উৎপত্তি হৈল সংসারে।
..　..　..　..　..
..　..　..　॥　　} ২৫
..　..　..　..　..
..　..　..　।
শীঘ্র কহিতে বচন　তাহাতে জন্মিল পবন
　　আনল জন্মিল ক্রোধ হৈতে ॥

(ক) দ্রষ্টব্য : বলা আবশ্যক যে এই পুস্তকের প্রায় সর্বত্র 'প্রভু' বা 'ঈশ্বর' না লিখিয়া তৎস্থলে 'গোসাঞি' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। তবে, কোথাও কোথাও 'ভগবান' শব্দের ব্যবহার যে নাই, এমন নহে। 'করতার' শব্দের ব্যবহারও বিরল নহে। ইহার কারণ কি?

মনে হয়, শেখ জাহেদ আরবী 'রব্ব্'(رب) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ গ্রহণ করিতে গিয়া এই কাজ করিয়াছেন। যদ্দ্বারা—

"আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখী, ভেকী, স্মার্তজাত গোসাঁই।।"

বুঝাইয়া থাকে, তেমন কোন 'গোসাঞি' নহে। বরং যেই 'গো' শব্দে পৃথিবী, স্বর্গ, জল, বাণী, জ্যোতি, গায়ত্রী-মন্ত্র, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি বুঝায়, তাহার যে স্বামী, তিনিই 'গোস্বামী'। সুতরাং, ইহা আমার মতে আরবী 'রব্ব্' (رب) বা প্রতিপালক, প্রভু অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(খ) দ্রষ্টব্য : এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক, এবং তাহা হইল, যখন 'আদ্য-পরিচয়' লিখিত হয়, তখন কবীরের (১৩৯৮-১৪৪৮) খ্যাতনামা 'রাম রহীম না জুদা কর ভাই দিলকো সচ্চা রাখ জী' এর সময়। তাহার প্রভাবও যে নাই, তাহাই বা কে বলিবে?

২১. অলঙ্ঘ্য সাগর—এখানে 'অলঙ্ঘ্য' শব্দের অর্থ 'অসীম, অনন্ত'। এখন প্রশ্ন হইল,—এই 'অসীম সাগর' কিসের সমুদ্র? অন্ধকারের, জ্যোতির, না জলের? অধিকন্তু, তখন এক অদ্বিতীয় অজাত-প্রভু ব্যতীত আর কিছুই সৃষ্ট হয় নাই। 'অলঙ্ঘ্য সাগর' আসিল কোথা হইতে? এখানে ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের একটি উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে;—জগৎ সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টা 'স্বধা' (ইহাই ফারসী 'খোদা' শব্দের মূল, যেমন—'স্বপ্'=خواب=খোয়াব) প্রকৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া এক ও অভিন্নরূপে ছিলেন এবং সৃষ্টি করিবার কল্পনা লইয়াই তিনি ঐ 'অলঙ্ঘ্য অব্যক্ত সমুদ্রে' এক মূর্তি সৃষ্টি করিলেন। তাহা হইলে এই সমুদ্র জলের নহে, 'স্বধা'-র বা খোদার অস্তিত্বের। জলের উৎপত্তি পরে হইয়াছে।

২২. মিত্ত—মিত্র, বন্ধু। এখানে 'নূর-ই-মুহম্মদীর' কথাই বলা হইয়াছে (ভূমিকা দ্র.)

মিত্তের অঙ্গের মলি[২৬] নিজ করে তাহা তুলি
ফেলাইল জলের উপরে।
মিত্তিকা[২৭] বাড়এ জলে সমুদ্রের উৎথালে[২৮]
দিনে দিনে হএ প্রসরে[২৯] ॥
জন্মিল চারি-রত্ন[৩০] পাইআ মহাযত্ন
স্রধাএ[৩১] সৃজিল গোসাঞি।
সংসারেত জত জন্মে[৩২] সব হএ কের্মে কের্মে[৩৩]
ওহাবই[৩৪] অন্য কিছু নাঞি ॥

---

২৩. হুঙ্কার—গর্জন, আওয়াজ। এই আওয়াজ ছিল 'কুন্' সৃষ্টি হউক। অমনি সৃষ্টি হইল।

২৪. হরিষ—সং. হর্ষ > হরিষ (স্বরভক্তিতে) = আনন্দ।

২৫. এই অংশ পাণ্ডুলিপিতে 'ছাড়'।

২৬. মলি—(গায়ের) ময়লা। শব্দটির ব্যুৎপত্তি—সং. মলিন (বিণ) > মলি, মলী = মলযুক্ত। মূলে শব্দটি বিশেষণ হইলেও বিবর্তনান্তে 'বিশেষ্য'রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন হইয়াছে 'পানি' < পানীয় (সং.)।

২৭. মিত্তিকা—সং. মৃত্তিকা (প্রা. ঋ = ই); মাটি

২৮. উৎথাল—স্ফীতি; তরঙ্গ। শব্দটির ব্যুৎপত্তি—সং. উৎস্থলী > প্রা. উত্থল্লী > উত্থালি > উৎথাল = উচ্ছ্বাস, স্ফীতি।

২৯. প্রসর—বিস্তার, ব্যাপ্তি। ব্যুৎপত্তি—সং. প্র + √সৃ (গমন করা, বিস্তৃত হওয়া) + অল(অ) + ভা. = প্রসর

৩০. চারি রত্ন—ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ(জল), তেজ(অগ্নি), মরুত(বায়ু)—এই চারিটি মহামূল্যবান বস্তু।

৩১. স্রধাএ—শ্রদ্ধায়, ইচ্ছায়। বাংলা 'সাধ' (খাওয়ানো) শব্দ এই শব্দ হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্ধ-তৎসম রূপ হইল 'স্রধা', 'শ্রধা'। ইহার তদ্ভব রূপ—শ্রদ্ধা > সদ্ধা > সাধ = ইচ্ছা।

৩২. জন্মে—জন্মে, উৎপন্ন হয়।

৩৩. কের্মে কের্মে—'ক্রমে-ক্রমে'এর অর্ধ-তৎসমরূপ।

৩৪. ওহাবই—উহা ব্যতীত। এইখানে দুইটি শব্দ রহিয়াছে; তাহার একটি 'ওহা', অন্যটি 'বই'। উৎপত্তি—
'ওহা'—সংস্কৃত 'অদস্' শব্দ জাত। অদস্ > প্রা. অহা, ওহা > উহা (আধুনিক)
'বই'—সং. ব্যতীত > *বইঅ > বঈ > বই(?)
অথবা

জত ছিল ভয়ঙ্কর[৩৫]　　সব হইল প্রচার
হুঙ্কারে করিল নির্মাণ।
রচিল তিন জীব[৩৬]　　তাহাতে দিআ শিব[৩৭]
সৈন্যমিক[৩৮] কৈল স্থানে স্থান॥
জন্মিল দেব অসুর[৩৯] বলে হইল প্রচুর
বাহুবলে ন চিনে অন্যথা[৪০]।
নিরবধি করে রণ নাঞি জানে মরণ[৪১]
কাহো[৪২] সনে নাঞিক মমতা

সং. বহিঃ>বহী>বহি>বই (ব্যতীত অর্থে)

৩৫. জত ছিল ভয়ঙ্কর—ভয় উৎপাদক যাহা কিছু ছিল অর্থাৎ দৈত্য, ভূত, প্রেত, অপদেবতা ইত্যাদি যাহা ছিল, তাহা এক হুঙ্কারে নির্মিত হইল।

৩৬. তিন জীব—নিরঞ্জন গোসাঞি তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য 'ব্রহ্মা', 'বিষ্ণু' ও 'মহেশ্বর' নামক তিনটি জীবকে সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা 'জীব' রূপে পরিণত হন নাই। তারপর তাহাদের মধ্যে 'শিব' অর্থাৎ প্রাণ দেওয়া হইল। এবং তাহারা জীবে পরিণত হইলেন।

৩৭. শিব—তন্ত্রশাস্ত্রের মতে 'শব' (মৃতদেহ) এবং 'শিব' এক; কেবল মধ্যখানে 'ই'-কার রূপ শক্তির যোগে (যেমন শ+ই+ব) শবদেহ 'শিবে' পরিণত হয়। অতএব, 'শিব' শব্দের অর্থ 'প্রাণশক্তি' এবং এই প্রাণশক্তিই 'ই'। ইহা যেন বীজমধ্যস্থ আটিমধ্যে লুক্কায়িত প্রাণশক্তি।

৩৮. সৈন্যমিক—ইহা লিপিকর প্রমাদ; কেননা এইরূপ কোন অর্থবহ শব্দ এই পর্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। ইহার সম্ভাব্য পাঠ দুইটি হইতে পারে, যথা—'সৈন্যমুখ' অথবা 'সৈন্যমুখ্য'। উভয় শব্দের অর্থ—'প্রধান-সৈন্য'। ভগবান-গোসাঞি 'ব্রহ্মা', বিষ্ণু', 'মহেশ্বর' এই তিন জীবকে তাঁহার বিশ্ব-রচনার তিন স্থানে ('স্থানে স্থানে') তিন কর্তব্য পালন করিবার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করিলেন এবং দায়িত্ব তিনটি হইল—ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবেন, বিষ্ণু পালন করিবেন এবং মহেশ্বর আবশ্যক মত ধ্বংস সাধন করিবেন বা প্রলয় ঘটাইবেন।

৩৯. দেব অসুর—দেবতা ও অসুর। লক্ষণীয়—ভারতীয় আর্যের 'দেবতা' ইরানী আর্যদের 'দেও' এবং ইরানীদের 'অহুর' (মেঝ্‌দা) ভারতীয়দের 'অসুর'। (মেধা)।

৪০. অন্যথা—অন্যরূপ। অন্য+থা (প্রকারার্থে)=অন্যথা-বিপরীত।

৪১. মরণ—দেবাসুর চিরকাল যুদ্ধ করে; কিন্তু তাহারা মরে না।

৪২. কাহো—কাহারও। ইহা সম্বন্ধ পদের শব্দ,—প্রাচীন রূপ। ব্যুৎপত্তি—সং. কস্য>কস্স>কাস>কাহ+ও<ওই<অই<অপি (সং.)।

ঘোড়া হস্তী প্রখর[৪৩] রাক্ষস জে ভয়ঙ্কর
রাজত্ব করে চিরকাল।
ভুঞ্জিল আপন মনে উপেখি বিবিধ বিধানে
ন চিনে কেবা সৃজিল সয়াল[৪৪] ॥
প্রভু (সে) করিল মনে আমা কেহ নাঞি চিনে
কি কারণে করিলুঁ প্রকাশ।
ক্রুদ্ধ হৈআ জত দেও[৪৫] সব জে করিল খও[৪৬]
কেহো কেহো কৈল বংশ নাশ[৪৭] ॥
নির্মূল করিআ দেও সংসারেত[৪৮] নাঞি কেও
এমন গেল কতো[৪৯] দিবস।
পুনর্বার করিল মনে মনুষ্য সৃজোঁ ভুবনে
তাহা হৈতে পাইমু হরিষ ॥

তাহাক করিমু রাজা জীবেরে করিমু প্রজা
পৃথিবী সাজিআ দিমু মহীতলে।
(তাহাক) করিমু প্রবীণ পূজে জেন রাত্রি দিন
তেয়াগিয়া সকল জঞ্জালে[৫০] ॥
* আর কতো সৃজিল কাহাত[৫১] সুখ ন পাইল
মনুষ্য করিমু সৃজন।
আপনার অঙ্গ ছিল আর কতো নির্মাইল
কেমনে হএ মনুষ্য আকার ॥ *

---

৪৩. প্রখর—অতি তীক্ষ্ণ; ধারালো। এখানে শব্দটি 'তেজীয়ান' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শক্তিশালী, বলবান অর্থও সার্থক।

৪৪. সয়াল—শব্দটি 'সমগ্র' অর্থবাচক। শব্দটি বিশেষণ। ইহার সঙ্গে যে বিশেষ্য বসে তাহা 'সংসার'। 'সয়াল সংসার' কথাটি চট্টগ্রামের কবিরা প্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ 'সমগ্র' জগৎ। উৎপত্তি: সং. সকল>সঅল> সয়াল ('য়'-শ্রুতিতে)।

৪৫. দেও—দৈত্য। শব্দটি ফার্সী دیو =দেও। ইহার মূল—সং. দেব>দেওঅ> দেও। ফার্সীতে মন্দ অর্থে ব্যবহৃত।

৪৬. খও—ক্ষয়>খঅ>খও=নষ্ট

৪৭. কেহো কেহো কৈল বংশ নাশ—দৈত্যেরা ক্রুদ্ধ হইয়া অনেকে অনেকের বংশ ধ্বংস করিল।
কেহো=কেহ। ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ: সং. কঃ+অপি=কোঽপি> কেহই>কেহো>কেহ।

৪৮. সংসারেত—অধিকরণ কারকে 'ত' প্রত্যয় প্রাচীন। ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পালি এবং প্রাকৃত ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে এই ব্যুৎপত্তিই সমীচীন বলিয়া মনে হয়: -ত্র>-ত্ত>-ত (যেমন, গৃহত্র>ঘরত্ত>ঘরত)।

৪৯. কতো—মূলে 'কথো'। ইহা সংস্কৃত 'কিম্' শব্দ জাত বলিয়া মনে হয় না। পালি 'কিত্তক' এবং প্রাকৃত 'কেত্তক' হইতে আদিম প্রাকৃত *'কত্তক' শব্দ কল্পনা করা যায়। এই *কত্তক>কত্তঅ>কাত>কত।

৫০. জঞ্জাল—হিন্দী শব্দ। ইহার অর্থ—ঝঞ্ঝাট, উৎপাত।

সেবক জাহেদ কএ[৫২]　　শুন গুরু মহাশএ
শতে শতে প্রণতি আমার।
ভাবিআ চরণ তোমার　　লিখিব আমি পয়ার[৫৩]
জেমতে[৫৪] হএ মনুষ্য আকার[৫৫]॥

॥ ইতি প্রথম অধ্যায়ঃ সৃষ্টিতত্ত্ব সমাপ্ত ॥

---

৫১. কাহাত—কাহারও কাছ হইতে। এখানে ব্যবহৃত '-ত' বিভক্তি অপাদান কারকের,—অধিকরণ কারকের নহে।

*...*এই চিহ্নবর্তী অংশের অর্থ সুস্পষ্ট নহে; 'সৃজন' শব্দের সহিত 'আকার' শব্দের অন্ত্যানুপ্রাসেও মিল নাই। মনে হয়, এইখানে আরও দুই চরণ বাদ পড়িয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, লিপিকর তাঁহার আদর্শ পাণ্ডুলিপির পাঠ উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া অংশটি বাদ দিয়াছেন। অন্য পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত না হইলে, এই সমস্যার সমাধান করা যাইবে না।

ইহাতে এবং ইহার পূর্ববর্তী কয়েক চরণে 'আদম' বা 'মনুষ্য' সৃষ্টির ইসলামী ধারণা স্থান পাইয়াছে। ভূমিকায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। তথাপি তাহার পুনরুক্তি বাঞ্ছনীয়। সূফীদের কথায় আল্লার 'নূরের' এক বিন্দুতে 'নূর্-ই-মুহম্মদী' বা হজরত মুহম্মদের 'নূর' সৃষ্ট হইল এবং মুহম্মদের (দঃ) 'নূরের' এক বিন্দুতে যাবতীয় সৃষ্টি উদ্ভূত হইল। তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের কাছে মাটি দিয়া 'আদম' (মনুষ্য) সৃষ্টির বাসনা ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন,—انی جائل فی الارض خلیفة "নিশ্চয় আমি (আদমকে) পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিব"। ফেরেশতারা ইহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমরাই ত অহোরাত্র তোমার পূজা করিতেছি, আবার মানুষ সৃষ্টি করিয়া কাজ কি? অধিকন্তু, মানুষ পরস্পর খুনাখুনি করিয়া জগৎকে রক্তরঞ্জিত করিয়া ধ্বংস করিবে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের এই আপত্তি না শুনিয়া 'আদম' সৃষ্টি করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি যাহা জানেন, ফেরেশতারা তাহা জানেন না। অতএব, 'আদম' বা 'মনুষ্য' সৃষ্ট হইল। আদিষ্ট হইয়া ফেরেশ্‌তারা আদমকে (মানুষকে) সজিদা বা প্রণিপাত করিলেন। শয়তান প্রণিপাত করিল না বলিয়া অভিশপ্ত হইল।

৫২. কএ—কহে, বলে। ব্যুৎপত্তি—সং. কথতি>কথই>কহই>(অই=এ)>কহে>কএ।

৫৩. পয়ার—চৌদ্দ মাত্রায় (অক্ষরে) রচিত (প্রতি) চরণ বিশিষ্ট দুই চরণের পদ্য। মধ্যযুগে এই ছন্দকে 'ক্ষিপ্রছন্দ', 'খর্বছন্দ' এবং 'পয়ার'-ও বলিত। ব্যুৎপত্তি—সং. পদকার>পঅআর>পয়ার ('য়'-শ্রুতিতে)।

৫৪. জেমতে—যেই প্রকারে, যেইভাবে।

৫৫. মনুষ্য আকার—মানুষের আকৃতি বা গঠন। এইখানে মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থা হইতে ধীরে ধীরে মানব-শিশু কিভাবে শরীরের কোন্ জিনিস প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে মানুষের রূপ লাভ করার পর ভূমিষ্ট হয়, তাহাই বুঝানো হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে তাহার বিশদ-বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্মতত্ত্ব

॥ ক্ষিপ্রছন্দ ॥

সৈন্ধবী রাগ

সুনহ[১] আদ্য-কথা[২] মন করি থির[৩]।
কেমতে[৪] উৎপত্তি হএ[৫] মনুষ্য শরীর ॥
মায়ের চারি-দ্রব্য[৬] পিতার চারি-ধন[৭]।
অনাদ্য[৮] ধর্ম্মের জথ বৈসএ[৯] রতন ॥

---

১. সুনহ—তোমরা শুন। সং. √শ্রু=প্রা. √সুণ্+(অনুজ্ঞায়) থ=সুণথ>সুণহ=শুন

২. আদ্য-কথা—মানুষের শরীর পিতার ঔরসে ও মাতার জঠরে জন্ম লাভ করিবার মূলতত্ত্ব। বলাবাহুল্য সচরাচর 'দেহতত্ত্ব' বলিতে যাহা বুঝায় 'আদ্য-কথার' অর্থ তাহা নহে।

৩. থির—সং. স্থির>থির।

৪. কেমতে—কি প্রকারে। সং. কিম্>প্রা. কিং>বাং. কি+মত+এ=কিমতে>কেমতে।

৫. হএ—হয়। সং. ভবতি>প্রা. হোতি>হোই>হোএ>হএ।

৬. মায়ের চারি দ্রব্য—'ফকীর বিলাস', 'ওজুদনামা' প্রভৃতি মুদ্রিত পুস্তকে দেখা যায়, মায়ের কাছ হইতে সন্তান যে চারি বস্তু লাভ করিয়া থাকে, তাহা এইরূপ :- 'গোশ্ত্' (মাংস), 'পোশ্ত্' (চাম্ড়া), 'পশম' (লোম) 'খুন' (রক্ত)।

৭. পিতার চারি ধন—ঐ উৎস হইতে আরও জানা যায়—পিতার কাছ হইতে সন্তান যে চারি বস্তু লাভ করে, তাহা হইল, 'অস্থি,' 'মজ্জা', 'শৌর্য', 'বীর্য'।

৮. অনাদ্য ধর্ম্ম—সৃষ্টির পূর্ববর্তী আদিবিহীন যে 'গোসাঞি-নিরঞ্জন', মানব-শরীরে তাঁহার দান দশটি, যথা—বাক্‌শক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ঈমান (আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাস), মনীষা (বুদ্ধি), চৈতন্য (জীবন্ত অবস্থা), জীবন (পরমায়ু), রুহ্ (আত্মা), শরীর। এই পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৯. বৈসএ—সং. উপবিশতি>প্রা. উবইসই>বইসই>বইসএ>বৈসএ

জাবত আছএ[১০] বিন্দু[১১] শরীর ভিতর।
অধিক পোড়এ[১২] তনু মদনে[১৩] জর্জর॥
রূপ রেখ ন হএ[১৪] চন্দ্র পবিত্র আছে অঙ্গে।
জীবন-জৌবন সব বৈসএ তার সঙ্গে॥[১৫]
চন্দ্র[১৬] বন্দি হৈলে অধিক বাঢ়এ[১৭] রতি।
চন্দ্র থাকিলে হএ কন্দর্প-মূরতি॥
সেই চন্দ্র যদি কোন প্রকারে হয় ব্যয়।
বিনি সিনানে কন্ম কৈলে মহাপাপ হয়॥[১৮]

---

১০. আছএ—থাকে। সং. √অস্+ছ+তি=পা. অচ্ছতি>প্রা.>অচ্ছই>আছই>আছএ (আধু. আছে)।

১১. বিন্দু—বীর্য, শুক্র। তন্ত্রে সৃষ্টির মূল উপাদান 'চন্দ্র' বা 'বিন্দু' নামে অভিহিত হয়। এই শাস্ত্র অনুসারে 'সহস্রার' মধ্যে ব্রহ্মবিন্দু, 'ভ্রূ'মধ্যে রজোবিন্দু এবং 'মূলাধার' মধ্যে তমোগুণাত্মক বিন্দুর অবস্থান। এই মূলাধারাবস্থিত 'বিন্দু' হইতেই মানব-দেহ বা পিণ্ডের উৎপত্তি বলিয়া পরিকল্পিত। সমার্থক শব্দ: চন্দ্র, শুক্র, বীর্য, মনী (আরবী)=মানী, রেতঃ।

১২. পোড়এ—জ্বলে, যন্ত্রণা পায়। সং. √পুট্=প্রা.√পুড়্+তি=পুড়তি>পুড়ই>পুড়ে>পোড়ে।

১৩. মদনে—যৌনসম্ভোগ-কামনায়।

১৪. রূপ রেখ ন হএ—কোন আকৃতি বা রূপ ধারণ করে না। ভবতি>হোতি>হোই>হএ। বীর্য যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে থাকে, ততক্ষণ পাক-পবিত্র অবস্থায় বিরাজ করে এবং তখন পর্যন্ত ইহার কোন বিশিষ্ট রূপ বা বর্ণ থাকে না।

১৫. জীবন....সঙ্গে—শুক্রের বা বীর্যের সঙ্গে মানুষের জীবন যৌবন মিশিয়া রহিয়াছে। ইহাতে তান্ত্রিক প্রতিধ্বনি শুনা যায়, যেমন,—"মরণং বিন্দু পাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ"। অর্থাৎ বীর্যপাতের দ্বারা মৃত্যু ঘটে, এবং বিন্দু ধারণ ক্ষমতা হইতে (দীর্ঘ) জীবন ধারণ সম্ভবপর হয়। ব্রহ্মচর্য পালন নীতি এই তান্ত্রিক তত্ত্বনির্ভর বলিয়া মনে হয়।

১৬. চন্দ্র—বীর্য, শুক্র।

১৭. বাঢ়এ—বৃদ্ধি পায়। সং. বর্ধতে>বড্ঢতে>বাঢ়এ>(আধু.) বাড়ে।

১৮. বিনি....হয়—মুসলিম ধর্ম মতে যৌন-সম্ভোগের পর শরীর অপবিত্র হয়; এই অবস্থায় কোন কাজ করা 'হারাম' বা নিষিদ্ধ। সুতরাং, বিশেষ বিধানে স্নান করিয়া মানুষকে পবিত্র হইতে হয়।

বিনি[১৯] সিনানে[২০] জে করএ[২১] জল পান।
পাপ বাঢ়এ খাএ[২২] অভক্ষ্য[২৩] সমান ॥
ইহাক[২৪] অধিক হেন নাহিক সংসারে।
তাহাত[২৫] নানান সৃষ্টি করে করতারে[২৬] ॥
দেব গন্ধর্ব[২৭] নর করে নানান রঙ্গ।
একি (য়েকে) * রূপের ছটায় মুনির মন ভঙ্গ ॥
অবস্তু বস্তু করিতে[২৮] তাহা বিনু কেবা পারে।
হেন হীন বস্তু লৈআ নানা সৃষ্টি করে ॥

---

১৯. বিনি— ইহা একটি বাংলা 'অনুসর্গ' (Post position)। ইহার কয়েকটি রূপ দেখা যায়, যথা—'বিনু', 'বিহন,' 'বিনা', 'বিহুন'। শব্দটি সংস্কৃত 'বিহীন' (বিণ) শব্দের অপভ্রষ্ট রূপ এবং মধ্য বাংলায় ইহার 'বিনু', 'বিনি' 'বিহুন' রূপ বহুল প্রচলিত।

২০. সিনান—সং. স্নান>(স্বরভক্তিতে) সিনান (কথ্য-'সেয়ান')।

২১. করএ—সং. √কৃ—করতি>করই>করএ>করে (আধু.)।

২২. খাএ—সং. খাদতি>খাঅই>খাএ>(আধু.) খায়।

২৩. অভক্ষ্য—খাওয়ার অযোগ্য। এখানে 'হারাম' অর্থে ব্যবহৃত।

২৪. ইহাক— ইহার। শব্দটি কর্মকারকের নহে,—সম্বন্ধ পদের। সম্বন্ধ পদের জন্য 'ক'-বিভক্তির ব্যবহার ব্যবহৃত ভাষার প্রাচীনতাদ্যোতক। ইহা সং. কৃতম্>কৃত>কত>কঅ>ক: আধুনিক যুগে ইহার ব্যবহার লোপ পাইয়াছে।

২৫. তাহাত— তাহার দ্বারা। করণ কারকে-'ত' বিভক্তির ব্যবহারও ভাষার প্রাচীনতাদ্যোতক। অধিকরণ কারকের জন্য সংস্কৃত-'ত্র', {'বনত্র' হইতে—'বনত্র'>বনত্ত> বনাত> বনত (ত্র>ত)} -'ত' রূপে করণ কারকে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৬. করতার—সং. 'কর্তৃ' শব্দের প্রথমার এক বচনে 'কর্তা' এবং ইহার বহুবচনের রূপ হইল 'কর্তারঃ'। অতঃপর স্বরভক্তিতে 'করতার'। 'করতার' শব্দের বিস্তৃত টীকার জন্য পৃষ্ঠা ৩২ দ্রষ্টব্য।

২৭. গন্ধর্ব— এক শ্রেণীর স্বর্গীয় গায়ক। গানই যাহাদের ধর্ম,—এই অর্থে 'গন্ধর্ব' শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ।

২৮. অবস্তু ---- করিতে—বীর্যের ন্যায় নাপাক-বস্তুকে (অবস্তু) পবিত্র বস্তুতে পরিণত করিতে করতার (=তাহা) ব্যতীত আর কে পারে?

*একি— মূলে 'য়েকে'। ইহার কোন অর্থ হয় না। সম্ভবতঃ ইহা 'একি'।

সেই চন্দ্রের লোক[২৯] সুনহ[৩০] বিচার[৩১]।
আউট[৩২] রতি চন্দ্র ন ছিল সংসার[৩৩]॥
কহিমু চন্দ্রের ভেদ[৩৪] গুরু উপদেশে।
আউট রতি চন্দ্র জে স্থানে জে বৈসে[৩৫]॥
বেকতে[৩৬] কহিলে তত্ত্ব হইব উদার[৩৭]।
রাখিআ কহিমু কিছু অন্তরের সার[৩৮]॥

---

২৯. লোক— সম্বোধন পদ—'হে লোকসকল।'

৩০. সুনহ— তোমরা শুন। ইহার উৎপত্তির জন্য 'গৌরচন্দ্রিকার' প্রথম চরণের টীকা দেখুন (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৩০)।—সং: √শ্রু=প্রা. √সুন্+থ=সুনথ >সুনহ।

৩১. বিচার— তত্ত্বের ব্যাখ্যা বা তত্ত্বালোচনা। অথবা তত্ত্ব-নির্ণয়।

৩২. আউট— অর্থ ও উৎপত্তির জন্য 'গৌরচন্দ্রিকার' পঞ্চম-চরণ (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা : ৩১)। সং. অর্ধচতুর্থ=আধ-কম-চার অর্থাৎ সাড়ে তিন।

৩৩. আউট----সংসার— মানুষের শরীরে রমণোপযোগী শুক্র নাকি ওজনে সাড়ে তিন রতির সমান (আউট রতি চন্দ্র)। গোপাল পণ্ডিত [অষ্টাদশ শতাব্দী] তাঁহার "রতিমঞ্জরী" (বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পুঁথির তালিকা-সংখ্যা—১০৮৯ দ্রষ্টব্য) নামক গ্রন্থেও বলেন :

"আহুট রতি চন্দ্রের প্রকার শুন কথা।
জিভ্রা ত্বকে চক্ষু আর পূর্ণ চন্দ্র জথা।"

এই সাড়ে তিন রতি চন্দ্র বা বীর্য মনুষ্য শরীরে না থাকিলে, মানুষের গার্হস্থ্য-জীবন (সংসার) লুপ্ত হইত।

৩৪. ভেদ— 'গূঢ়-তত্ত্ব,' 'রহস্য' অর্থে ব্যবহৃত। মধ্যযুগে শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইত।

৩৫. আউট----বৈসে—সাড়ে তিন রতি পরিমাণ মনুষ্য-শুক্র তাহার সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে না। বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এই চন্দ্র (বীর্য) অবস্থান করে। গুরুর অনুমতি (উপদেশ) লইয়া কোন্ চন্দ্র কোন্ অঙ্গে বা প্রত্যঙ্গে কখন অবস্থান করে, সেই রহস্য (ভেদ) আমি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব।

৩৬. বেকতে— 'ব্যক্ত' শব্দের স্বরভক্তিতে। ইহার অর্থ 'ব্যক্ত বা প্রকাশ করিয়া'।

৩৭. উদার— সুবিস্তৃত, বিশাল, প্রশস্ত। ব্যুৎপত্তি—উৎ (মুক্ত) +আ+√ঋ (গমন করা)+অল্ (র্ত্)=উদার

৩৮. রাখিয়া----সার—গূঢ়তত্ত্বের (অন্তরের সার) কিছুটা গুপ্ত রাখিয়া কিছুটা ব্যক্ত করিব।

॥ চ এ খ এ ॥[৩৯] এই দুই অক্ষরে বৈসে দুই রতি চন্দ্র।
॥ জ এ ব এ ॥[৪০] আধ রতি চন্দ্র মনে হয়ে ধন্ধ।।
॥ ম এ গ এ জ এ ॥[৪১] এই তিন অক্ষরে বৈসে এক (য়েক) রতি।
তাহা জানিলে পিণ্ডের[৪২] হয়ত মুকতি[৪৩] ॥

আড়াই[৪৪] রতি চন্দ্র সঙ্গমে হয় ক্ষয়[৪৫]।
নিজ চন্দ্র[৪৬] রতি তাহাতে নয় ব্যয় ॥

---

৩৯. চ এ খ এ —যৌগিক 'হ্রীং', 'ক্রিং' শ্রেণীর ঐন্দ্রজালিক ধ্বনির অনুকরণে উদ্ভাবিত দুর্বোধ্য সাঙ্কেতিক ধ্বনির দৃশ্য রূপ। এই ধ্বনিগুলি 'আউট রতি চন্দ্রের' (সাড়ে তিন রতি পরিমাণ বীর্যের) শারীর-স্থান নির্দেশক নাম। এই নামগুলিতে উচ্চারিতব্য স্বর-ধ্বনি বাদ দিয়া শুধু ব্যঞ্জন-ধ্বনিগুলিই দেওয়া রহিয়াছে। যেহেতু কোন স্বর-ধ্বনি ব্যতীত শুধু ব্যঞ্জন-ধ্বনি উচ্চারিত হয় না, সেহেতু ব্যঞ্জন-ধ্বনিগুলির সহিত কেবল একটা সহজে উচ্চার্য '-এ' ধ্বনি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, 'চ্' এবং 'খ্' ব্যঞ্জন-ধ্বনির সহিত অর্থবহ স্বর-ধ্বনি যোগ করিয়া শারীর-স্থান আবিষ্কার করিতে হইবে। এইখানে 'চ্'-এর সহিত-'ও' এবং 'খ্'-এর সহিত, -'অ' যোগ করিলে 'চোখ' হয়। চরণটিতে মানুষের দুই চোখে 'দুই রতি চন্দ্র' অবস্থিত —এই কথাটিই বুঝানো হইয়াছে; অর্থাৎ প্রথমে দুই চোখে দেখিয়াই মানুষের মনে যৌনসম্ভোগ-স্পৃহা জাগ্রৎ হয়,—এই কথা বুঝানো হইয়াছে।

৪০. জ এ ব এ—প্রাগুক্ত পদ্ধতি স্মর্তব্য জ্+ই+ব্+অ=জিব<জিহ্বা। এই জিহ্বায় 'আধ রতি চন্দ্র'।

৪১. ম এ গ এ জ এ—প্রাগুক্ত পদ্ধতি স্মর্তব্য। ম্+অ+গ্+অ+জ্+অ= মগজ। এই 'মগজে' 'একরতি চন্দ্র'।

৪২. পিণ্ডের—দেহের, শরীরের।

৪৩. মুকতি— সংস্কৃত 'মুক্তি' শব্দ স্বরভক্তিতে 'মুকতি'।

৪৪. আড়াই—সং. অর্ধতৃতীয় (অর্থাৎ আধ কম তিন)। ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ : অর্ধতৃতীয়>অড্‌চ তিঈঅ>আঢইঅ>আঢ়াই>আড়াই।

৪৫. আড়াই----ক্ষয়—এক এক বারের যৌন-সম্ভোগান্তে, অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গমের পর, মানুষের আড়াই রতি পরিমাণ বীর্য ক্ষয় হয়।

৪৬. নিজ চন্দ্র—ইহার দ্বারা 'শুক্র' বা 'রস' বুঝায়। তন্ত্রশাস্ত্র মতে কুলকুণ্ডলিনীকে 'নিজ চন্দ্র' বলা হয়। বীজমার্গী সম্প্রদায় 'রস' বা 'শুক্রকে' পরম-ব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করে। কারণ, তাহাদের মতে শুক্র হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি।

জেদিনে মনুষ্যের তনু সৃজিল করতারে[৪৭]।
সেই দিনে নিজ চন্দ্র তাহাতে উতারে[৪৮]॥
নিজ চন্দ্রের উপৎপনা[৪৯] ইহা ভালে[৫০] জানি।
এহি চন্দ্র ভেদিয়া গোর্খ কহিল কাহিনী[৫১]॥

শেখ জাহেদ 'আউট চন্দ্র'-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন বটে; এতৎসত্ত্বেও চারি চন্দ্রের কথা নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা এইরূপ :

(ক) আদ্য চন্দ্র, (খ) নিজ চন্দ্র,
(গ) ইলিমিলি চন্দ্র, (ঘ) গরল চন্দ্র।

বলা প্রয়োজন যে, ষোড়শ শতাব্দীর মুসলিম কবি শেখ ফয়জুল্লা ও তাঁহার 'গোরক্ষ-বিজয়' গ্রন্থে 'চারি চন্দ্রের' কথা উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

"তিন চন্দ্র সম্বরিয়া, আপনা দিয়া
গরল যে চন্দ্র কর পান।
তিন চন্দ্র সম্বরিয়া, গরল চন্দ্র ভক্ষিয়া
তবেহ সকল রক্ষা পাএ॥"

(পরিষৎ সংস্করণ—পৃ. ১১৫)

চন্দ্রের সংখ্যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চার। এই চারি চন্দ্রের রহস্য ভেদ করিতে পারিলে—

"চারি চন্দ্র ভেদ যদি যোড় মনে করে।
না রহিবে রোগ পীড়া মৃত্যু পলায় ডরে॥
নিজ চন্দ্র ভেদ যদি করিবারে পারে।
ঘর হইতে পঞ্চ আত্মা কভু নাহি লড়ে॥"

(নাথধর্মও সাহিত্য—প্রফুল্ল চক্রবর্তী)

প্রাগুক্ত ক, খ, গ, ঘ,—এই চারি চন্দ্রের রহস্য ভেদ করিতে পারিলে, মানুষের পক্ষে নাকি অমরত্ব লাভ সম্ভব।

৪৭. করতার— 'করতার' শব্দের বিস্তৃত টীকার জন্য 'গৌরচন্দ্রিকার' দ্বাদশ চরণের টীকা দেখুন। (পৃষ্ঠা : ৩২ দ্রষ্টব্য)

৪৮. উতারে— অবতরণ করায়; নামায়। শব্দটির বুৎপত্তি :
সং. উত্তারয়তি>উতারঅই>উতারই>উতারে।

৪৯. উপৎপনা—ইহা একটি বিশিষ্ট শব্দ। এই অধ্যায়েই শব্দটি দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ—'উৎপত্তি', 'উৎপাদন'। ইহার মূল রূপ 'উৎপন্ন' বিশেষণ পদ; কিন্তু ব্যবহৃত হইয়াছে বিশেষ্য রূপে; যেমন 'পানীয়' হইতে 'পানি'। [ধারাবাহিক]

আদ্য চন্দ্র[৫২] পুতা[৫৩] গুরু মুখে জান ।
নিজ চন্দ্রে[৫৪] পুতার রহিল পরান ॥
ইলিমিলি চন্দ্র[৫৫] ঝুলাইলেক[৫৬] তাএ ।
গরল চন্দ্র[৫৭] ভখিলেক[৫৮] শ্রীগোর্খনাএ[৫৯] ॥

বলা বাহুল্য, শব্দটিতে এমন এক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যাহাকে ভাষাতত্ত্বে Haplology বা 'সমাক্ষর-লোপ' বলে, ঠিক তাহার বিপরীত একটি ব্যাপার ইহাতে ঘটিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ইহাতে সম-অক্ষরের 'আগম' ঘটিয়াছে, লোপ হয় নাই। মূলশব্দ 'উৎপন্ন'-এর 'উ' এবং 'ৎ'-এর মাঝখানে একটি 'প' বর্ণের আগম এবং অন্ত্য-'অ' স্বরের 'আ' স্বরে পরিণতি লক্ষণীয়। এই 'প'-ধ্বনির আগম পরবর্তী 'প-'ধ্বনির প্রভাবেই ঘটিয়া থাকিবে এবং অন্ত্য সংযুক্ত 'ন্ন'-এর একটি লোপ পাওয়ায়, অন্ত্য-'অ' স্বরের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই-'অ' দীর্ঘ হইয়া-'আ' স্বরে পরিণত হইয়াছে।

৫০. ভালে জানি—ভাল করিয়া জানি। 'ভাল' শব্দের সহিত 'এ'-কারের ব্যবহার লক্ষণীয়। ইহা সংস্কৃতের ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তির (যেমন 'ধীরং গচ্ছতি') ন্যায় বাংলায় ও ক্রিয়াবিশেষণে-'এ' বিভক্তির ব্যবহার, যেমন 'ধীরে চ ', 'আস্তে বল' ইত্যাদি। সং. ভদ্রক > ভল্লঅ > ভাল + এ = ভালে।

৫১. এহি - - - - কাহিনী—'নিজ চন্দ্রের' অজ্ঞাত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া গোরক্ষনাথ বিবরণ বা কাহিনীর আকারে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়ায়, এতকাল যাহা অজ্ঞাত ছিল, তাহা আজ সুপরিজ্ঞাত হইয়াছে। [গোরক্ষ > গোরকৃখ > গোর্খ = গোরক্ষনাথ। তিনি নাথপন্থী ৮৪ সিদ্ধার অন্যতম ছিলেন। ইনি মীননা > মৎস্যেন্দ্র নাথ-এর শিষ্য হইলেও, সাধনা বলে গুরুর চেয়েও অধিক জ্ঞান লাভ করেন] বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

৫২. আদ্য চন্দ্র—ইহার অপর নাম 'আদি চন্দ্র'। ইহা 'মহারস' নামেও পরিচিত। ইহাকে 'সোম' বা 'অমৃত-রস'-ও বলা হয়। মস্তকে 'সহস্রার' অধোমুখ সহস্র-দল পদ্ম অবস্থিত। ইহা হইতে সর্বদা সুধা ক্ষরিত হয়। (ষট্-চক্র-নিরূপণ)

৫৩. পুতা— পুত্র > পুত্ত > পুত + আ (আদরে) = পুতা (যেমন—পাগলা, রামা)। নিম্নের ৫৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৪. নিজ চন্দ্র—ইহার দ্বারা 'শুক্র' বা 'রস' বুঝায়। তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে কুলকুণ্ডলিনীকে 'নিজ চন্দ্র' বলা হয়।

৫৫. ইলিমিলি চন্দ্র—তুল. 'হিলিমিলি,' 'হিলিবিলি', 'ইলিবিলি' প্রভৃতি শব্দ। ইহার অর্থ 'আঁকাবাঁকা', 'চঞ্চল' ইত্যাদি। নাথ-সাহিত্যে 'উন্মত্ত চন্দ্র' বলিয়া একটা কথা আছে। এই 'উন্মত্ত চন্দ্রের' অর্থ 'মন বায়ু'। সুতরাং, এই 'ইলিমিলি চন্দ্রকে' উন্মত্ত চন্দ্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

জাবত আছএ চন্দ্র পুরুষের শরীরে ।
মহাকামভাব[৬০] উপজএ[৬১] তাহারে ॥
সেই চন্দ্র জাএ[৬২] জবে স্ত্রীর শরীর ।
মানি হৈআ সম্তাএ[৬৩] তাহার উদরে ॥
দশ মাস থাকি পুন বাহির হএ ।
পুত্র[৬৪] হৈআ চন্দ্র থাকএ[৬৫] নিশ্চএ ॥

---

৫৬. বুলাইলেক—বুলাইল+এক (সম্ভ্রমার্থে)=বুলাইলেক>(আধুনিক) বুলাইলেন। প্রা.√বোল্ল=বাং.√বুল্+ইল (অতীত তিঙ্)=বুলাইল।

৫৭. গরল চন্দ্র—ইহাকে 'অমৃত' বলা হয়। এই 'অমৃত' দেহস্থিত 'ওজস' রূপ 'অমৃত'। 'সহস্রার'-চক্র হইতে ক্ষরিত চন্দ্রামৃত ইড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতি নাড়ীপথে প্রবাহিত হইয়া 'মূলাধারে' আসিয়া পতিত হইলে 'গরলে' পরিণত হয়। যোগীরা 'প্রাণায়াম' প্রভৃতি যোগক্রিয়া দ্বারা এই 'অমৃত'-কে 'গরলে' পরিণত হইতে দেন না। তাঁহারা স্বয়ং এই অমৃত পান করিয়া জরা ও মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে সচেষ্ট হন।

৫৮. ভখিলেক—উপরের টীকা দ্রষ্টব্য। সং.√ভক্ষ্=বাং.√ভখ্>ইল=ভখিল। দ্রষ্টব্য ৫৭ সংখ্যক টীকা।

৫৯. গোর্খনাএ—গোরক্ষনাথ+এ=গোর্খনাহ+এ (=এন>এঁ>এ)=গোর্খনাহে >গোর্খনাএ—গোরক্ষনাথ কর্তৃক।
গোরক্ষ পদাবলীতে তাঁহার পরিচয় এই রূপ :
"আদিনা -নাতি আর মচ্ছীন্দ্রের পুত।
বিন্দু রক্ষা করিয়াছে গোর্খ অবধুত ॥"

৬০. মহাকামভাব—সঙ্গম বা স্ত্রী-সম্ভোগ করিবার প্রবল ইচ্ছা।

৬১. উপজএ— উৎপত্তি হয়; জন্মে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি :
সং. উৎপদ্যতে>উপজ্জএ>উপাজএ>উপজএ।

৬২. জাএ— যায়। সং. যাতি>জাই>জাএ।

৬৩. সম্তাএ—প্রবেশ করে; সামায়। ব্যুৎপত্তি—সং.√সম্ (গমন করা)=প্রা. √সম্ত+তি=সম্ততি>সম্মাই>সামায়; অথবা—সম্ততি>সম্তই >সম্তাএ। উদাহরণ :
"ভল্লুক সম্তায় গাড়ে ভয়ে কম্পমান।
তাড়িয়া মহিষ ধরে উপরে বিষাণ ॥ (কবিকঙ্কণ)

৬৪. পুত্র— এখানে শব্দটির অর্থ—'সন্তান'

৬৫. থাকএ— থাকে। ব্যুৎপত্তি—সং.√স্থগ্ (সংবরণ করা)=প্রা.√থক্—তি =থক্কতি>থাকই>থাকএ>থাকে (আধু.)

মানি[৬৬] হৈআ পৈসে[৬৭] পুত্র হৈআ প্রচারে[৬৮]।
হেন অদ্ভুত কম্ম[৬৯] করে করতারে ॥
আর কত চন্দ্রের আছএ বিচারে[৭০]।
সমাধিআ[৭১] কহিল ভয় করিআ সংসারে ॥[৭২]

চন্দ্রেত মনুষ্য তনু করএ উপৎপনা[৭৩]।
হেন কম্ম করিতে পারে কোন্ জনা[৭৪] ॥
পিতার চারি দ্রব্য[৭৫] লৈআ জাএ [৭৬] সঙ্গ।
তাহাত[৭৭] বুঝিলে বাড়এ মহারঙ্গ ॥

---

৬৬. মানি— আরবী 'মনী' (منی) = বীর্য, শুক্র।

৬৭. পৈসে—প্রবেশ করে। ব্যুৎপত্তি—সং. প্রবিশতি > পইসই > পৈসে।

৬৮. প্রচারে— 'প্রকাশ পায়' 'বাহির হয়' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬৯. কম্ম— কাজ। সং. কর্ম > প্রা. কম্ম > বাং. কাম।

৭০. বিচার— বিবেচনার বিষয়। বি + √চর + ঘঞ্ (ভাববাচ্যে) = বিচার।

৭১. সমাধিআ—'সমাধি' নামক ধ্যানমগ্ন হইয়া অর্থাৎ পূর্ণ বাক্-সংযম করিয়া। 'সমাধি' শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার লক্ষণীয়।

৭২. সমাধিআ- - -সংসারে—'চন্দ্র' বা বীর্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা অত্যন্ত সংযত-বাক্ অবস্থায় মিতভাষী হইয়া বলা হইয়াছে। কারণ, মনে মনে সংসারী-লোকের ভয় বিদ্যমান।

৭৩. উপৎপনা—এই অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশ চরণে শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহাতে দীর্ঘ টীকা সংযোজিত হইয়াছে। পৃ. ৪৯-৫০।

৭৪. চন্দ্রেত মনুষ্য- - -কোন্ জনা—এই শ্লোকের সরল অর্থ হইল, অপবিত্র বীর্য হইতেই মানুষের শরীর উৎপন্ন এবং একমাত্র প্রভু করতার ব্যতীত এমন অদ্ভুত ও অসম্ভব কাজ আর কেহ করিতে পারে কি? না, পারে না। এই দুই চরণের সহিত সূফী কবি শৈখ্ সা'দীর (মৃ. ১২৯২ খ্রী.) বুস্তাঁ-গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির মিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট :

دهد نطفه را صورتے چون پری —
که گر دست بر آب صورتگری +

(প্রতিবর্ণায়ন)

দিহিদ্ নুৎফহ্ রা সূরৎ-এ চূঁ পরী।
কিহ্ গর্ দস্ত বর্ আব্ সূরৎগরী ॥

(অনুবাদ)

অপবিত্র শুক্রকে পরীর ন্যায় সুন্দর মূর্তি দান করেন
মূর্তিনির্মাতা ;—যদিও তাহা তাঁহার হাতে জলরূপে আসে।

অস্থি মজ্জা বল বিজ্জ পিতার শরীরে।
পিতার চন্দ্র আর অঙ্গে জথ[৭৮] শিরে[৭৯]॥
সঙ্গম সময়ে সেহি করএ অভিসার[৮০]।
এহি চারি দ্রব্য লৈআ উদরে সঞ্চার[৮১]॥

আনল বরুণ লৈআ সেহিত সময়।
বাই মিত্তিকায় সেহি তখনি জন্মায়[৮২]॥
সঙ্গম সময়ে তনু হএত বিকল।
ঘষণে[৮৩] মঞ্জনে[৮৪] তাহে জন্মএ আনল॥
মহাবেগ[৮৫] পাইআ বিন্দু শরীরেত[৮৬] পৈসে।
সেহিত সময়ে পিণ্ডে[৮৭] বাই গিআ বৈসে॥
শ্রমরতি[৮৮] হৈআ জবে পড়এত ঘম্ম[৮৯]।
বিন্দু জল সম হৈআ তাহাতেই জন্ম[৯০]॥

---

৭৫. পিতার চারি দ্রব্য—অস্থি, মজ্জা, বল ও বীর্য।

৭৬. জাএ—যায়। সং. যাতি>জাই>জাএ>(আধু.)যায়।

৭৭. তাহাত—তাহাকে। কর্মে অধিকরণের ব্যবহার লক্ষণীয়।

৭৮. জথ— অন্যত্র 'জত' রূপও দেখা যায়। ইহার সম্ভাবিত ব্যুৎপত্তি— সং. যৎ+-তক (পরিমাণে)=যত্তক>প্রা. জত্তঅ>জত>(আধু.) যত।

৭৯. শিরে—শিরায়, নাড়ীতে।

৮০. অভিসার—গোপনে প্রবেশ; অনুপ্রবেশ।

৮১. সঞ্চার—'আবির্ভাব ও বিস্তৃতি' অর্থে ব্যবহৃত।

৮২. আনল- - - -জন্মায়—আব, আতশ, খাক, বাদ=জল, অগ্নি, মৃত্তিকা ও বায়ুর সমষ্টিতেই মানুষের দেহ গঠিত। নর-নারীর সঙ্গম-কালে এই চারিবস্তুর জন্ম হয়।
সেহি ত সময়—সঙ্গম কালে।
বাই—বায়ু। সং.বায়ু>বাউ>বাই।
মিত্তিকা—মৃত্তিকা (ঋ=ই)

৮৩. ঘষণে—ঘর্ষণে। ঘর্ষণ দ্বারা। করণে 'এ' বিভক্তি।

৮৪. মঞ্জনে—মাজনে। এ-স্থলে শব্দটি 'মর্দন' অর্থে ব্যবহৃত।

৮৫. মহাবেগ—সঙ্গম-কালে বীর্যস্খলন ঘটাইবার জন্য যেই প্রবল বেগ বা গতির সৃষ্টি করিতে হয়, তাহার নাম 'মহাবেগ'।

জলের ভিতরে চন্দ্র কেহ নাঞি জানে।
নিজ চন্দ্র উতরে জেন মিত্তিকা সমানে[৯১] ॥
আর জত জত ধন পাএ দিনে দিনে।
এই চারি মহারত্ন[৯২] জন্মে জন্মস্থানে ॥
মাতা পিতা সঙ্গমে সয়াল[৯৩] করে সৃষ্ট[৯৪]।
হেন মাতা পিতা না ভজে দুরদৃষ্ট ॥
জে পুত্র মাতা পিতার আশীর্বাদ লএ[৯৫]।
ধনে বংশে বাঢ়ে সেহি জাবৎ জিয়এ[৯৬] ॥
মাতা পিতার বচন জেবা না করে লংঘনা।
সভা মধ্যে থাকে তাক,[৯৭] গণে এক জনা[৯৮] ॥

---

৮৬. শরীরেত—এই শব্দে অধিকরণে ব্যবহৃত-'ত' বিভক্তি লক্ষণীয়। এই বিভক্তিটি সংস্কৃত-'ত্র' (যেমন—সং. গৃহত্র>প্রা. ঘরত্ত>বাং. ঘরত অর্থাৎ-ত্র>-ত্ত>-ত) হইতে আগত এবং -'ত্র' সংস্কৃতে স্থান-বাচক বিভক্তি। বাংলায় ব্যবহৃত 'সর্বত্র'='সর্ব+ত্র', 'যত্র', 'তত্র' প্রভৃতি শব্দ স্মর্তব্য।

৮৭. পিণ্ড—পারিভাষিক শব্দ; ইহার অর্থ—'দেহ'।

৮৮. শ্রমরতি—রতিনির্গমনজনিত পরিশ্রম।

৮৯. ঘম্ম—সং. ঘর্ম>প্রা. ঘম্ম>বাং. ঘাম।

৯০. শ্রমরতি - - জন্ম—রতি বা বীর্যনির্গমনজনিত পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া, যখন নরের শরীর হইতে ঘাম নির্গত হয়, তখন বিন্দু অর্থাৎ বীর্য জলের মত তরল অবস্থায় নারীর শরীরে প্রবেশ করে। জলসদৃশ এই তরল শুক্র বা বীর্য হইতেই মানুষের জন্ম হয়।

৯১. জলের ভিতরে- - - - মিত্তিকা সমানে—এই শ্লোকটির বক্তব্য এইরূপ: যতক্ষণ চন্দ্র বা বীর্য মাতা-পিতার শরীরে জলীয় আকারে থাকে, ততক্ষণ ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কিছু অবগত থাকে না; আর ইহা যখন সঙ্গমের পর পিতার শরীর হইতে মাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া স্থায়ী হয় ও ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তখন ইহা কাহারও দৃষ্টির অগোচর থাকে না। নদীর মোহনায় স্রোতোধারা-বাহিত পলীমাটি সঞ্চিত সামুদ্রিক চড়ার মত ইহা শক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে।

৯২. এই চারি মহারত্ন—আব, আতশ, খাক, বাদ,—এই চারিটি মৌলিক-উপাদান (আরবী—'আর্‌বা উনাসির')।

৯৩. সয়াল—সব কিছু। সং. সকল>প্রা. সঅল>বাং. সয়াল।

৯৪. করে সৃষ্ট—'সৃষ্টি করে'-এর স্থলে 'সৃষ্ট করে' প্রয়োগটি লক্ষণীয়। ইহাতে সংস্কৃত নিষ্ঠান্ত পদের প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং সেই জন্য ভাষার প্রাচীনতাদ্যোতক।

সেবকের প্রায় হৈআ থাকে জেই জন।
মাতা পিতার আশীর্বাদে বৈকুণ্ঠে[৯৯] গমন ॥
পিতার বচন জানে পরাণ সমান।
রাজছত্র বাঢ়ে[১০০] হএ[১০১] অভয় কল্যাণ ॥
মাতা পিতা থাকে সুখী সেহি সে পুত্রতা[১০২]।
মিছা[১০৩] কাজে পূজে নর অন্য সে দেবতা ॥
সকল তেয়াগিআ মাতা পিতার সেবা করু[১০৪]।
সাধিবে[১০৫] আপন তনু পিতা বর-গুরু[১০৬] ॥
বর-গুরু মাতা পিতা সৃজিল করতার।
জার বিন্দু হইতে দেখিল সংসার ॥

---

৯৫. লএ—লাভ করে। ব্যুৎপত্তি—সং. লভতে>প্রা. লহএ>বাং. লএ।

৯৬. জিয়এ—জীবিত থাকে। ব্যুৎপত্তি : জীবতি>জিওঅই>জিঅই>জিঅএ> (আধু.) জীয়ে।

৯৭. তাক—কর্মকারকের পদ—'তাহাকে'।

৯৮. এক জনা—একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা গণ্যমান্য ব্যক্তি।

৯৯. বৈকুণ্ঠ— 'বিষ্ণুলোক'-এর নাম। এখানে সাধারণ অর্থ 'স্বর্গ' বুঝাইতেছে।

১০০. রাজছত্র বাঢ়ে—'রাজছত্র' ক্ষমতার প্রতীক। অতএব, 'রাজছত্র বাঢ়ে' (বাড়ে)' কথার অর্থ দাঁড়ায়, 'রাজদ্বারে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়'। সং. বর্ধতে>বাড্ঢএ>বাঢএ>বাঢে>বাড়ে (আধু.)।

১০১. হএ— সং. ভবতি>প্রা. হোতি>হোই>হএ>হয়।

১০২. পুত্রতা— পুত্রত্ব; পুত্রের গুণ। 'পুত্র' শব্দের সহিত 'তা' প্রত্যয় যোগে 'পুত্রের গুণ' বুঝানো অধুনা অপ্রচলিত। মধ্যযুগে এই শব্দের বহুল প্রচলন ছিল।

১০৩. মিছা— সং. মিথ্যা>মিচ্ছা>মীছা>মিছা=অসত্য। তুল. সত্য>সচ্চ >সাচ+আ=সাচা (তুল. হিন্দী 'সচ্চা')

১০৪ করু—; ইহা অনুজ্ঞার রূপ; 'কর' অর্থে ব্যবহৃত। সংস্কৃত √কৃ ধাতুর অনুজ্ঞায় 'কুরু' >করু (তুল. ব্রজবুলি 'করু')। 'করু' শব্দের ব্যবহার 'আদ্য-পরিচয়' পুস্তকের ভাষার প্রাচীনতাদ্যোতক।

১০৫. সাধিবে— সেবা (পিতা-মাতার) করাকে সাধনার ব্যাপারে পরিণত করিবে।

১০৬. বর-গুরু— ইহা একটি প্রাচীন পারিভাষিক কথা। তুলনীয়—'বরগুরু বঅনে কুঠারেঁ ছীজই'' (চর্যাপদ ৪৫)। ইহার অর্থ—সদগুরু; শ্রেষ্ঠগুরু।

পড়িআ সুনিআ দেখ ভারত[১০৭] পুরাণে[১০৮]।
পিতা বিনু গুরু নাঞি ই[১০৯] তিন ভুবনে॥
মাতা পিতা অগোচরে জেবা তিখ[১১০] করে।
পুণ্যের নাঞিক লেস[১১১] মহাপাপ বাঢ়ে॥
মাতা পিতা আদেশে জেবা কম্ম করে।
ঘোরতর মহাবিঘ্নে মহাসুখে তরে[১১২]॥
বালকেক[১১৩] জথ স্রধা[১১৪] করে মাতা পিতা।
তাহার ভাগের ভাগ[১১৫] করিতে নারে পুতা॥
জথ দুখে মাতা পিতা বালক[১১৬] মনুষ্য করে।
সে সব কহিতে মোর শরীর বিদারে॥
দশ মাস গর্ভে থুইআ[১১৭] জথ[১১৮] পাএ দুখ।
তাহার অন্ত কহিতে বিদরে সেলে বুক॥

---

১০৭. ভারত— মহাভারত। ইহা বেদব্যাস মুনি বিরচিত। ইহা ভরত-বংশ-চরিত-মূলক একটি মহাকাব্য।

১০৮. পুরাণ— ব্যাসাদি নানা মুনি রচিত 'পুরাণ' নামে খ্যাত শাস্ত্র। এই 'পুরাণ' সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত নামক পাঁচটি লক্ষণে চিহ্নিত। 'পুরাণ' অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত; ইহাদিগকে 'মহাপুরাণ' বলা হয়। এতদ্ব্যতীত 'উপপুরাণের' সংখ্যাও কম নহে।

১০৯. ই— সং. ইদম্>প্রা. ইদং>অপ. ইঅ>প্রা. বাং. এ, ই=এই (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য : পৃ. ৩৬)।

১১০. তিখ— তীর্থ, পবিত্র স্থান। সং. তীর্থ>প্রা. তিত্থ।

১১১. লেস— লেশ, সামান্য পরিমাণ।

১১২. তরে— পার হয়। সং. √তৃ—তরতি>তরই>তরএ>তরে।

১১৩. বালকেক— বালককে, সন্তানকে। এখানে কর্মকারকে-'ক' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। উচ্চারণ সৌকর্যার্থে এই -'ক' বিভক্তি -'এক' রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা সংস্কৃত 'কৃত' হইতে আগত বলিয়া স্বীকৃত। সং. কৃতম্>কতং>কত>কঅ>ক।

১১৪. স্রধা— 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্ধতৎসম রূপ। ইহার অর্থ 'স্নেহ'।

১১৫. ভাগের ভাগ—অনেক ভাগের এক ভাগ।

১১৬. বালক মনুষ্য করে—সন্তানকে লালন-পালন করিয়া বড় করে।

১১৭. থুইআ— রাখিয়া। সং. স্থাপয়িত্বা>থাবইআ>থুইআ।

প্রসব কালেতে আর কত দুক্ষ[১১৯] আছে।
চারি পাঁচ বৎসর মাতার আধেক[১২০] অন্ন পচে[১২১] ॥
রাত্রি দিন কোলে[১২২] লৈআ থাকে সেহি পুত।
ভোজন সময়ে খাএ[১২৩] মাতা আধেক বিষ্ঠা মুত ॥
হেন মাতা পিতার সুখ জে না জন্মাএ অন্তরে।
দুখ্যেয়তা[১২৪] হএ সেহি পুত্র জন্মে জন্মান্তরে[১২৫] ॥
মাতার বচন জেবা হেলা করি জানে[১২৬]।
অন্তকালে ভুঞ্জিব সেহি নরক ভোবনে[১২৭] ॥
জেহি পুতা মাতা পিতাক[১২৮] ন করিব ভয়।
অধোগতি জাইব সেই চিরজীব[১২৯] নয় ॥

---

১১৮. জথ=জত—ব্যুৎপত্তি —যৎ+ -তক (কল্পিত)=যত্তক>জত্তঅ>জত [গৌরচন্দ্রিকার ১৬ চরণের টীকা দ্রষ্টব্য]

১১৯. দুক্ষ— দুঃখ। উচ্চারণে 'ক্ষ'='কখ'। সুতরাং, 'দুক্ষ' শব্দ বাংলা উচ্চারণে 'দুক্‌খ'<সং. দুঃখ।

১২০. আধেক— অর্ধেক। সং. অর্ধ+এক>আধ+এক=আধেক।

১২১. পচে— সং. √পচ্+তি=পচতি>পচই>পচে।

১২২. কোলে— কোল+এ (অধি.)। সং. ক্রোড়>কোড়>কোল (ড়=ল)।

১২৩. খাএ—সং. খাদতি>খাঅই>খাএ।

১২৪. দুখ্যেয়তা—দুক্ষীয়া+তা (?)=দুখ্যেয়তা (গ্রাম্য উচ্চারণে)। অর্থ সুস্পষ্ট—দুঃখে কাতর অবস্থা অথবা দুঃখভোগ করিতেছে, এমন অবস্থা। ব্যুৎপত্তি: দুঃখিততা>দুক্ষিঅতা>দুখ্যেয়তা (?)

১২৫. জন্মান্তরে—অন্য জন্ম 'জন্মান্তর'। ইহার অর্থ 'পরজন্মে'।

১২৬. হেলা করি জানে—জানে যে (মায়ের কথায়) কোন গুরুত্ব না দিলেও চলে।

১২৭. ভোবনে— ভুবনে, লোকে, (নরক) লোকে।

১২৮. পিতাক—কর্মকারকে-'ক' বিভক্তি ভাষার প্রাচীনতা-দ্যোতক। ইহা সং. কৃতম>কতং>কত>কঅ>ক।

১২৯. চিরজীব— 'চিরঞ্জীব' শব্দের (চিরম্+জীব=চিরঞ্জীব) বাংলা রূপ লক্ষণীয়। ইহা অর্থ (সে) 'চিরঞ্জীব' (নহে)।

মাতা পিতা বঞ্চিআ জেবা ভরাএ উদরে।
তাহার শরীরে ব্যাধি বাড়ে গুরুতরে[১৩০]॥
মাতা পিতা বচন জেবা করএ লংঘন।
অল্পাই[১৩১] হইআ জাএ নরক ভোবন॥
জাহেদ কহএ মাতা পিতা দেবী দেবা[১৩২]।
জার কম্ম ভাল সে করিতে পাএ সেবা[১৩৩]॥
জন্ম সময়ে যদি জন্মে ভাল খেনে।
কম্মভোগ ভুঞ্জে হএ রাজ সম্মানে॥
চারি খেনের কথা সুনহ বিচার।
জেই খেনে জন্মিলে জে ফল হএ তার॥
চারি খেনের বিচার জাহাতে জেবা হএ।
একে একে গোসাঞি[১৩৪] তাহাত সৃজএ॥

---

১৩০. গুরুতরে— ক্রিয়া-বিশেষণে -'এ' বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়। ইহার অর্থ 'গুরুতরভাবে'। সংস্কৃতের ক্রিয়ার-বিশেষণে ব্যবহৃত দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রভাবে '-এ'।

১৩১. অল্পাই—অল্প+আয়ু(>আউ>আই)=অল্পায়ু>অল্পাই অর্থ—অল্পজীবী।

১৩২. দেবা— 'দেবী' শব্দের পুংলিঙ্গে 'দেব' না হইয়া বাংলায় 'দেবা' হইয়াছে। তুল. বাং প্রবাদ—'যেমন দেবা, তেমন দেবী।' বোধ হয় বাংলা 'পাঁঠা'-'পাঁঠী', 'শালা'-'শালী' প্রভৃতির অনুকরণে বা প্রভাবে নিয়মিত 'দেব-দেবী' না হইয়া 'দেবা-দেবী' হইয়াছে।

১৩৩. জাহেদ - - -সেবা—এই শ্লোকটির সহিত পূর্ববর্তী এই শ্লোকটি স্মর্তব্য:

"মাতা পিতা থাকে সুখী সেহি সে পুত্রতা।
মিছা কাজে পুজে নর অন্য সে দেবতা।।"

আলোচ্য শ্লোকদ্বয়ে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটির প্রতিধ্বনি মিলিতেছে:

"পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥"

অর্থাৎ

পিতা স্বর্গ (তুল্য), পিতা ধর্ম (স্বরূপ) এবং পিতাই পরম তপস্যার বস্তু। পিতার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলে, সর্বদেবতা সন্তুষ্ট হয়।

১৩৪. গোসাঞি—গোস্বামী; প্রভু করতার।

তৃতীয় অধ্যায়

জন্মক্ষণ বিচার[১]

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

মাহেন্দ্র উত্তম কৈল বরুণ মধ্যম থুইল
ইহাতে আর অনথা নাঞি[২]।
দিন খেন[৩] করিলুঁ[৪] বন্ন[৫] ইহার অধিক অন্য
সংসারেত হৈল অগ্নি বাই[৬] ॥
বাই মন্দ কিঞ্চিৎ আনলে নাঞিক হিত
জেহ্নি খেনে জন্মএ সকলে।
জন্মজোগে[৭] থাকে দুখ সে কভু ন পাএ সুখ
ভালমন্দ ভুঞ্জে কম্ম ফলে[৮] ॥

---

১. এই 'তৃতীয় অধ্যায়ে' বর্ণিত ব্যাপারটি জ্যোতিষ শাস্ত্রীয়। এই শাস্ত্র অনুসারে মানুষের জন্মক্ষণ চারিটি, যথা—'মাহেন্দ্র', 'বরুণ', 'বায়ু' (বাই) ও 'অগ্নি'। মানুষ তাহার কর্মফলের প্রভাবে এই ক্ষণ চারিটির যে-কোন একটিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যেই ব্যক্তি যেই ক্ষণে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকেই তাহার 'জন্মযোগ' বলে। জন্মযোগে (জন্মজোগ) অর্থাৎ মানুষের জন্মসময়ে যেই সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদির যোগ বা সমাবেশ হইয়া থাকে, তাহাদের প্রভাবে নবজাতক প্রভাবিত হয় বলিয়া প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রীয় বিশ্বাস এখনও এ দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মনে দেখা যায়।

২. নাঞি, নাঞিক—ন+অসিৎ=নাসীৎ>নাসী>নাহী>নাহি>নাই (মধ্য বাং. নাঞি—সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী অনুনাসিক ধ্বনির প্রভাবে)। অতঃপর স্বার্থে-'ক'।

৩. খেন—ক্ষণ>খেন।

৪. করিলুঁ—করিলাম। ম. ধাং.—করিলুঙ। সং. 'অহম' জাত—'ঙ=ঁ।

৫. বন্ন—'বর্ণনা'-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণ(না)>বন্ন।

৬. বাই—সং. বায়ু>বাউ>বাই। তুল. আয়ু>আউ>আই।

৭. জন্ম জাগে—জন্মযোগে অর্থাৎ জন্মের সময়ে যেই সমস্ত শুভ-অশুভ নক্ষত্রের সমাবেশ ঘটে, নবজাতকের জীবনে তাহার প্রভাব পড়ে,—এমন জ্যোতির্বিদ্যা সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস।

মাহেন্দ্রে[৯] জেবা জন্মে রাজদণ্ড[১০] থাকে কম্মে
অবস্য হএ সে ধনবান।
ন ছাড়এ ঘোড়া হাথী[১১] রথ রথী সারথি
দিনে দিনে বাড়ে রাজ সম্মান[১২] ॥
বরুণ[১৩] খেনে জন্মে জেহ মধ্যম খেন পাএ সেহ
ধন তার হএ পুঞ্জে পুঞ্জে।
জন্মস্থানে অতি সুখ কভু সে ন পাএ দুখ
বরুণ খেনে হএ ফল ভুঞ্জে ॥
বায়ু[১৪] খেনে জন্ম লেশ[১৫] ফিরে সেহি দেশ দেশ
ভিক্ষা করএ সে ঘরে ঘরে।
মুনি হৈআ জোগে অন্ত[১৬] মুক্ত করে আপন পন্থ
নিতি নিতি গেয়ান প্রচারে ।।

---

৮. ভালমন্দ ভুঞ্জে কম্মফলে—মানুষ নিজের কর্মের ফলেই তাহার ভালমন্দ ফল ভোগ করিয়া থাকে।

৯. মাহেন্দ্র— মাহেন্দ্র (ক্ষণ) (বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত)। মহেন্দ্র+ঞ=মাহেন্দ্র (বিণ)। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সর্বোত্তম ক্ষণের নাম। ইহাতে জন্মগ্রহণ করিলে নবজাতক রাজা হয় এবং দুয়ারে হাতি-ঘোড়া বাঁধা থাকে।

১০. রাজদণ্ড— রাজ পদের নিদর্শন স্বরূপ রাজা যে দণ্ড হস্তে বহন করেন, তাহাকে 'রাজদণ্ড' বলে। ইংরেজীতে ইহাকে 'Sceptre' বলে।

১১. হাথী— 'হাতি' শব্দের বানানের প্রাচীনতর রূপ; হস্তী>হথী>হাথী>হাতি।

১২. রাজ-সম্মান—রাজা হিসাবে সম্মান বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ রাজা হইতে মহারাজ মহারাজ হইতে রাজাধিরাজ বা রাজচক্রবর্তী পদ লাভ করে।

১৩. বরুণ(ক্ষণ)—জ্যোতিষ-শাস্ত্রে মধ্যম ক্ষণ। এই ক্ষণে যাহার জন্ম হয়, সে আজীবন স্বদেশেই বাস করে ও ধনবান হয়।

১৪. বায়ু(ক্ষণ)—জ্যোতিষ-শাস্ত্রের তৃতীয় ক্ষণ। এই ক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলে মানুষ দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় ও ভিক্ষা করিয়া (সন্ন্যাসী বা যোগীর মত) জীবিকা বির্বাহ করে। এই ভিক্ষা মুনি, সন্ন্যাসী বা যোগীর ভিক্ষা। এই ক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলে লোক সাধক হয় ও পরকালের পথ প্রশস্ত করিতে মানুষের মধ্যে জ্ঞান প্রচার করিয়া বেড়ায়।

১৫. লেশ— সামান্য অংশ; অতি অল্প অংশ।
'বায়ু খেনে জন্ম লেশ'—জন্মক্ষণের একটি ক্ষুদ্র অংশও যদি বায়ু ক্ষণে পড়ে।

১৬. অন্ত—শেষ, অবসান।

আনল[১৭] খেনে জন্ম জার সেহি হএ বাটোয়ার[১৮]
কভু সে ন খাএ পেট ভরি।
আপন পেটের তরে সোয়াস্তি[১৯] ন পাএ ঘরে
অবস্য কখন সে করে চুরি ॥

জার জন্ম জেই খেনে তার ফল তেহি মানে[২০]
কর্মগতি করএ ভুঞ্জন।[২১]
জন্ম খেনে বিধাতা দেখে আড়াই অক্ষর লেখে
মিটাইলে ন জাএ মিটন ॥[২২]
বাপের শরীর হৈতে ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা পথে
মায়ের পেটে করএ প্রবেশ।
গোসাই সকল জানে খেলা করে রাত্রি দিনে
জার জেবা থাকএ বিশেষ ॥

---

১৭. আনল(ক্ষণ)—জ্যোতিষ শাস্ত্রের সর্বাধিক খারাপ ক্ষণ।

১৮. বাটোয়ার—আধুনিক 'বাটপার'='বাটপাড়'—অর্থ 'রাহাজান' 'পথের লুটেরা'। 'এবেঁ বাটোয়াড় হৈলা কাহ্নাঞি (শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন)' অথবা 'সেই পন্থে বাটোয়ার বৈসে অনুদিন (আলা)' বিবর্তনের ধারা সম্ভবতঃ এইরূপ : বর্ত্ম+বার {√বৃ (বারণ করা)+ঘঞ্ (ভা)}=বর্ত্মবার>বট্টবার> বাটওআর>বাটোয়ার।

১৯. সোয়াস্তি—স্বস্তি (বিপ্রকর্ষে)।

২০. তেহি মানে—তাহাকেই স্বীকার করিতে বা মানিতে হয়।

২১. কর্মগতি করএ ভুঞ্জন—কর্মের পরিণাম (কর্মগতি) অনুসারে কর্মফল ভোগ করিতে হয়।

২২. জন্ম খেনে----ন জাএ মিটন—নবজাতকের জন্মক্ষণ ভাল রূপে দেখিয়া লইয়া 'বিধাতা-পুরুষ' তাহার কপালে 'আড়াই অক্ষর' লিখিয়া দেন। ইহা একবার লিখিত হইলে আর মুছিয়া যায় না। এই 'আড়াই অক্ষর' কি? আমি এই অধ্যায় গভীর অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, 'আড়াই অক্ষর' দ্বারা 'কর্ম' বুঝানো হইয়াছে। কারণ, —'ক' (ক্+অ) একটি পূর্ণ অক্ষর ' 'রেফাকৃতির'র' অন্তঃস্থ বর্ণ বলিয়া অর্ধ-অক্ষর বা অর্ধস্বর (Semi Vowel) এবং রেফ নিম্ন 'ম' বর্ণও একটি পূর্ণ অক্ষর। সুতরাং, বিধাতা-পুরুষ নবজাতকের কপালে 'আড়াই অক্ষরে' যাহা লেখেন, তাহা ইহার 'কর্ম'। মহানির্বাণতন্ত্রেও দেখা যায়—

"কর্মণা সুখমশ্নান্তি, দুঃখমশ্নন্তি কর্মণা।
যায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্তন্তে কর্মণোবশাৎ ॥

অর্থাৎ

মানুষ কর্মদ্বারা সুখভোগ করে, দুঃখভোগও কর্মদ্বারাই করিয়া থাকে কর্মবেশে তাহারা জন্মগ্রহণ করে, আর কর্মবশেই তাহারা মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

জার জেবা থাকে কম্ম সেই দিনে তার জন্ম
ষষ্ঠী[২৩] লেখে তাহাত দেখিআ।
জন্ম হএ জার গতি কি করিতে পারে মতি
ভুলে সেই করমে ভুঞ্জিআ॥

কেহোএ চড়এ ঘোড়া কেহো কান্ধে[২৪] বহে দোলা[২৫]
কেহো বসিআ থাকে খাটে[২৬]।
কারো মাথে[২৭] নবদণ্ড[২৮] কেহো[২৯] হানে হস্তী মুণ্ড[৩০]
কেহো কেহো রাজ্য করে পাটে[৩১]॥
কারো দ্বারে রহে হাথী রথ রথী[৩২] সারথি[৩৩]
কেহো ভূমে নাঞি দেএ পাএ।
কেহো বা করিছে শ্রম কপালে[৩৪] পড়িছে ঘাম
কেহো[৩৫] দিনে নাঞি তোলে গাএ[৩৫]॥

কর্মজ সংস্কারই 'ভাগ্য'। কপালে কি লেখা আছে, তাহা কেহ দেখিতে পায় না বলিয়াই ভাগ্যকে 'অদৃষ্ট' বলা হয়।

২৩. ষষ্ঠী— ইহাঁকে 'মহাষষ্ঠী'-ও বলা হয়। নবজাতকের লালন, পালন ও রক্ষাকারিণী দেবীর সাধারণ নাম 'ষষ্ঠী'। শিশুর জন্ম হইলে, ষষ্ঠ দিনের রাত্রিতে সূতিকাগারেই ইহাঁর পূজা করিতে হয়। এই সময়ে দেবী নবজাতকের ভাগ্য লিখিয়া দেন।

২৪. কান্ধ—সং. স্কন্ধ>কান্ধ>কাঁধ।

২৫. দোলা—শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত: (১) চতুর্দোল>চৌদোল; (২) শব-বহনের খাটুলি বা খাটিয়া।

২৬. খাট—সং. খট্টা>খট্টা>খাট=পালঙ্ক, পর্যঙ্ক।

২৭. মাথে—সং. মস্তক>মথঅ>মাথ=মাথা+এ=মাথে

২৮. নবদণ্ড— রাজচ্ছত্র। বাং. রাজছত্র; রাজার মাথায় ধরা হয়, এমন ছাতা

২৯/৩০. কেহো হানে হস্তী মুণ্ড—কেহ 'মাহুত' হইয়া হস্তীর মাথায় অঙ্কুশ বিদ্ধ করে অর্থাৎ হাতীর চালক হয়।

৩১. পাটে—সং. পট্ট>পট্ট>পাট=সিংহাসন+এ=পাটে।

৩২. রথী—রথারোহী যোদ্ধা।

৩৩, সারথি—রথচালক; রথ পরিচালনাকারী।

৩৪, কপালে— কপাল হইতে (অপাদান কারকে-'এ' বিভক্তি)

৩৫/৩৫। কেহো দিনে নাঞি তোলে গাএ—সারাদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া ঘুমায় অর্থাৎ অকর্মণ্য ও অলস।

কেহো গাএ উঞ্চ[৩৬] স্বরে　　কেহ মহা নিত্য[৩৭] করে
কেহো বা বসিআ তাহা দেখে।
কেহো পড়ে কেহো গুণে[৩৮]　　কেহো বসি তাহা শুনে
কেহো[১৫] জন্ম করি তাহা লেখে ॥[৩৯]

কাহার কর্ম্মের ফলে　　লক্ষ লক্ষ জন পালে
কেহ আত্ম পেট[৪০] নাহি পোসে।
কেহো ধন রক্ষক　　কত আছে সেবক[৪১]
কেহ[৪২] আছএ আসে পাসে[৪২] ॥
কেহো ফিরে ভিক্ষা তরে　　কেহো বটকে[৪৩] জন্ম করে
কেহো লক্ষাবধি[৪৪] করে দান।
কেহো দেয় পানি[৪৫] পুখরি[৪৬]　　কেহো হাথে থালা[৪৭] করি
পেটের তরে পাএ[৪৮] অপমান ॥

---

৩৬. উঞ্চ—　　সং. উচ্চ>প্রা. উঞ্চ>বা উঁচু; তুল.—হিন্দী—উঁচা।

৩৭. নিত্য—　　সং. নৃত্য>অর্ধতৎসম 'নিত্য'=নাচ।

৩৮. গুনে—　　গণনা করে। সং. √গন্=বাং. √গুন+এ (নাম পু. ১ বচন)

৩৯. কেহ জন্ম করি তাহা লেখে—এখানে হিন্দু আমলে যাহাদিগকে 'কায়স্থ'> 'কায়েত', মুসলমান আমলে যাহাদিগকে 'মুন্সী' এবং ইংরেজ আমলে যাহাদিগকে 'কেরাণী'<করণিক (Clerk) আর বর্তমানে যাহাদিগকে 'সহকারী' (Assistants) বলা হয়, তাহাদের কথাই বলা হইয়াছে।

৪০. পেট—　　বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত ইহা একটি কৃতঋণ (Borrowed) শব্দ। ইহার মূল তামিল 'পেট্টু>পেটু>পেট। ইহার আর্য ভাষার (সংস্কৃতের) শব্দ 'উদর' বাংলায় পাওয়া যায় 'সহোদর'> সোদর>সোদ্দর (ভাই) শব্দে। 'উদরী', 'উদরাময়' শব্দগুলিও স্মর্তব্য।

৪১. সেবক—　　পরিচারক, ভৃত্য, দাস।

৪২. কেহ - - - আসেপাসে—কেহ কেহ পার্শ্বচর বা চাটুকার রূপে আশেপাশে বাস করে।

৪৩. বটকে—বট+ক+এ=বটকে। "বেণে বলে দর নাহি বাঢ়ে এক 'বট' (কবিকঙ্কন)। 'বট' শব্দ সংস্কৃত; ইহার অর্থ 'কড়ি'। সুতরাং, 'বটকে'=এক কড়িকে।

৪৪. লক্ষাবধি—এক লক্ষ (কড়ি) পর্যন্ত (দান করে)। স্মর্তব্য: রাজা লক্ষ্মণ সেন 'লাখ্‌বখ্‌শ্' (এক লক্ষ কড়ির দাতা) বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

কেহো[৪৯] জ্ঞানের লএ অন্ত[৫০] কেহো সিদ্ধ[৫১] সিদ্ধান্ত[৫২]
কর্মফলে কেহো হএ মুনি।
কেহো কহে ধর্মবাণী শ্রবণে তাহাএ শুনি
কেহো হৈল চন্দ্র[৫৩] জৈমিনি[৫৪] ॥
জার জেই কর্ম ফলে করতার জান এ সকলে
ভোগদশা সকল লিখন।
সুখ[৫৫]দুখ কপালে লেখা আর নাহি লেখাজোখা
জে দিবসে করিল সৃজন[৫৬] ॥

---

৪৫. পানি—ফার্সী শব্দ নহে; ইহাকে বড় জোর হিন্দী শব্দ বলা যায়। ইহা সংস্কৃত 'পানীয়'>পানি=জল। বিশেষণ শব্দের বিশেষ্য শব্দরূপে ব্যবহার লক্ষণীয়।

৪৬. পুখরি— বিভিন্ন রূপ—পুখরী, পোখরি, পোখরী। ইহার উৎপত্তি :-সং. পুষ্করিণী>পুক্‌খরিণী>পুখরিঁ>পুখরি, পোখরি

৪৫/৪৬. কেহে দেয় পানি পুখরি—আগের দিনে জনসাধারণের আচরণীয় পুকুর কাটাইয়া দেওয়াকে পু'য় কাজ বলিয়া গণ্য করা হইত। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পানির জন্য পুষ্করিণী কাটাইয়া দিয়া কেহ কেহ পুণ্য কাজ করে।

৪৭. থালা— স্থাল>থাল+আ (বৃহদর্থে)=থালা (বড় থাল)। স্থাল+ইকা (ক্ষুদ্রার্থে)=স্থালিকা>থালিআ>থালি।

৪৮. পাএ— সং. প্রাপতে {প্র+√আপ্ (পাওয়া)+তে}>পাপএ>পাএ=পায়।

৪৯/৫০. কেহো---অন্ত—কেহ কেহ নানা বিদ্যা ও জ্ঞান শেষ সীমা পর্যন্ত অর্জন করেন।

৫১. সিদ্ধ— (এই ভাবে জ্ঞান লাভ করার ফলে কেহ কেহ) 'সিদ্ধ' বা ত্রিকালজ্ঞ মুনিতে (পরিণত হন)।

৫২. সিদ্ধান্ত—জ্যোতিষ শাস্ত্রের নাম। এইখানে 'জ্যোতিষ-শাস্ত্রে' পণ্ডিত হইয়া 'সিদ্ধান্তবাগীশ' হন, এই কথা বুঝায়।

৫৩. চন্দ্র—ইঁহার নাম 'চন্দ্রকীর্তি'। ইনি এক খ্যাতনামা প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিক। তিনি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা ও বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন।

৫৪. জৈমিনি—পূর্বমীমাংসা-দর্শন প্রণেতা স্বনামখ্যাত মুনি। তাঁহার 'জৈমিনি-দর্শন' ও 'জৈমিনি ভারত' ভারতবিখ্যাত গ্রন্থ। কথিত আছে, ইনি বেদব্যাস মুনির শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার কাছেই 'সামবেদ ও 'মহাভারত' শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এখন ইঁহার রচিত মহাভারতের মধ্যে কেবল 'অশ্বমেধ'-পর্বই পাওয়া যায়। ইহাতে অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে যে, জৈমিনি মুনি সমগ্র মহাভারত রচনা করেন নাই, কেবল 'অশ্বমেধ'-পর্বই' রচনা করিয়া ছিলেন।

মরণ[৫৭] জীবন ধনে　　লেখা করে সেই দিনে
জে দিবসে গর্ভে জনময়[৫৮]।
কেহো গর্ভে হএ নাশ　　কেহো জিএ[৫৯] শত পঞ্চাশ
কেহো[৬০] চিরদিন বহি লয়[৬১]॥
শেখ জাহেদ কএ　　জানিহ জে সুনিশ্চএ
এই সব লিখনের বশ।
সব চিন্তা তেয়াগিআ　　তাক আছোঁ ধেয়াইআ
জাবত জিঞো দিবস দশ॥

৫৫/৫৬. সুখ- - -সৃজন—'অদৃষ্টে' বিশ্বাস হিন্দুর এক সাধারণ সংস্কার। বিধাতা-পুরুষ শিশুর জন্মের সময়ে তাহার কপালে ঐহিক জীবনে সে কি-কি করিবে, তাহা 'আড়াই অক্ষরে' লিখিয়া দেন। ইহার নাম 'কর্ম'। (পূর্বোক্ত টীকা দ্রষ্টব্য)। এই 'কর্ম' অপরিবর্তনীয়। বিশ্বাসটি ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সর্বত্র হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানের মনে বদ্ধমূল। 'কর্ম' যে ললাটের অমোচ্য লেখা, সেই বিশ্বাসের মূলে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটির দান প্রচুর :

"ললাটে লিখিতং যচ্চ ষষ্ঠী জাগর-বাসরে।
ন হরিঃ শঙ্করোব্রহ্মা চান্যথা কর্তুম্ ইতি॥"

অর্থাৎ
ষষ্ঠীর জাগর বাসরে যাহা জাতকের ললাটে
লিখিত হয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর তাহার অন্যথা
করিতে পারে না।

বিশ্বের মুসলমানগণও 'তক্‌দীর' (تقدير) মানিয়া থাকে। 'তক্‌দীর' শব্দের অর্থ হইল—'অবধারণ,' 'নির্ধারণ' অর্থাৎ মানুষ জীবনে যাহা করে, তাহা পূর্ব হইতে অবধারিত থাকে। তবে, এই অবধারিত কর্মতৎপরতা বা 'তক্‌দীর' কপালে লিখিত থাকে কি না, সেই বিষয়ে ইসলাম কিছুই বলে নাই। এই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত হদীথের (হাদীসের) অংশটি স্মর্তব্য :

فيكتب عمله و اجله و رزقه و شقى او سعيد

প্রতিবর্ণায়িত

ফ-য়ুকতুবু 'আমলহু ব্ 'অজলহু ব্ রিয্‌কহু
ব্ শকীয়ুন্ 'অব্ স'ঈদুন্—(মিশ্‌কাত শরীফ)।

অনুবাদ

(মাতৃগর্ভে থাকাকালীন) তাহার (মানবের) কর্মকাণ্ড এবং মৃত্যুকাল এবং তাহার জীবিকা এবং দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য লিখিত হইয়া যায়। (মিশকাত)।

এই প্রসঙ্গে 'গর্ভোপনিষদের' নিম্ন-উৎকলিত শ্লোকটির কথাও তুলনা করা যাইতে পারে :

"পঞ্চৈতান্যপি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ।
আয়ুঃ কর্মচ বিত্তঞ্চ বিদ্যানিধনমেব চ॥"

অর্থাৎ

(মানুষের) গর্ভাবস্থাতেই আয়ু (শুভাশুভ) কর্ম, বিত্ত,
বিদ্যা ও মরণ এই পাঁচটি (সৃষ্টি করিয়া) দেওয়া হয়।

শাস্ত্রে যাহা কিছুই থাকুক, হাদীস-কোরানে যাহা কিছুই বলুক, তক্‌দীর, 'প্রাক্তন,' 'অদৃষ্ট' প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস 'কপালের লেখা'-র প্রতি বিশ্বাসের যে সমার্থক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিশ্বাস প্রতিবেশী হিন্দুর বিশ্বাসের অনুকরণ ও অনুসরণ অথবা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত অবচেতন মনের অভিব্যক্তি মাত্র।

৫৭/৫৮. মরণ- - - -জনময়—যেই দিনে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের জন্ম হয়, সেই দিনেই ইহার মৃত্যু, আয়ু ও বিত্ত (লোহ্ মহ্‌ফুজে=সংরক্ষিত ফলকে) লিখিত হইয়া যায়। লেখা করে—(কর্মবাচ্যে) লিখিত হয়। মুসলমানের বিশ্বাস,—হায়াত (জীবন), মৌত বা মওত (মৃত্যু), রিযুক্ (জীবিকা), দৌলত (বিত্ত) এই চারি বস্তু আল্লার হাতে। এইগুলির সমন্বিত নাম 'তক্‌দীর'। এবং এই 'তক্‌দীর' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে التقدير لا يرد=অৎতক্‌দীরু লা য়রদ্‌দু অর্থাৎ তক্‌দীর পরিবর্তিত হয় না।

৫৯. জীএ— বাঁচে। সং. জীবতি>জীবই>জীওই>জীএ।

৬০/৬১. কেহো- - - বই লয়—কেহ কেহ সারা জীবন হাতে 'বহি' লইয়া জ্ঞানচর্চা করে।

বহি— 'পুস্তক' অর্থে বহি>বই (আধু.) সর্ব প্রথম বাংলা-ভাষায় কখন ব্যবহৃত হয়, তাহা কাহারও জানা নাই। আলোচ্য 'আদ্য-পরিচয়' পুস্তকেই মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় শব্দটি সর্বপ্রথম পাওয়া গেল। ইহা হইতে মনে হয়, মুসলমান ব্যতীত তখনও শব্দটি অন্য কেহ ব্যবহার করেন নাই। ইহা আরবী (وحى) বৃহী (প্রত্যাদেশ) শব্দ হইতে বাংলায় পুস্তক অর্থে ব্যবহৃত। 'কুরআন্' আল্লার প্রত্যাদেশ। ইহা যখন সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে এদেশের মুসলমানেরা ঘরে ঘরে পাঠ করিত, তখনও (এমন কি এখনও) ইহাকে অপরের কাছে 'বৃহী' বলিয়া মুসলমানেরা পরিচয় দিত। সুতরাং, লোকে মনে করিত 'বৃহী'=পুস্তক, গ্রন্থ। বৃহী=বহি>বই।

৪. আছোঁ—সং. অচ্ছামি>আছই>আছোঁ=আমি আছি।

চতুর্থ অধ্যায়

গর্ভের বিচার

|| ক্ষিপ্র ছন্দ ||

ভৈরবী রাগেণ গীয়তে

সুনহ আদ্যের, কথা,[১] করোঁ[২] নিবেদন।
জেমতে[৩] হৈল আদমের সৃষ্টি উপার্জন[৪]॥
পিতার চারি দ্রব্য[৫] লৈআ জাএ নর সঙ্গে।
মাতার চারি দ্রব্য[৬] তাহাতে রএ রঙ্গে॥
জেহি জেহি স্থানে থাকে দেহের জেবা অঙ্গ।
তাথে উপজএ[৭] মায়ের নানা রঙ্গ॥
চর্ম অঙ্গে মাতার দ্রব্য রহে খালি[৮]।
ওসিত[৯] আছএ অঙ্গে জথ রোমাবলী॥[১০]

---

১. আদ্যের কথা—পুস্তকের নাম 'আদ্য-পরিচয়'='আদ্যের কথা' এক বলিয়া মনে হইতেছে। 'আদ্য কথা' পুস্তকের 'আদ্য-পরিচয়' নামের সমার্থক ও সমর্থনকারী।

২. করোঁ— মুঞি করোঁ। সং. করোমঃ (বহুবচনের বিভক্তি-'মঃ')>অপ.করম>প্রা. বাং. করবঁ>মধ্য বাং. করওঁ>করোঁ>করো

৩-৪. জেমতে - - - উপার্জন—যেইরূপে মানুষের (=আদমের) সৃষ্টির প্রাপ্তি হইল। অন্য কথায়, যেইরূপে মাতৃগর্ভে মানুষের ভ্রূণের জন্ম হয় (তাহার কথা বর্ণিত হইল)।

৫. পিতার চারি দ্রব্য—অস্থি, মজ্জা, বল, বীর্য } বিস্তৃত বিবরণ পূর্ববর্তী

৬. মাতার চারি দ্রব্য—মাংস, চর্ম, লোম, রক্ত } অধ্যায় গুলিতে দ্রষ্টব্য।

৭. উপজএ— উৎপন্ন হয়। ব্যুৎপত্তি : সং. উৎপদ্যতে>উপ্পজতে>উপজএ >উপজয়।

৮. খালি— শুধু, কেবল। আরবী خالی=খালী

৯. 'ওসিত'=অসিত অর্থাৎ 'সিত' বা শুভ্র নয় এমন; কৃষ্ণবর্ণ।

১০. চর্ম অঙ্গে - - - রোমাবলী—এই শ্লোকে মায়ের চারি দ্রব্যের প্রতি ইঙ্গিত আছে। চর্মাবৃত শরীরে মায়ের দ্রব্যই থাকে অর্থাৎ চর্ম, মাংস ও রক্ত থাকে;

এহি চারি দ্রব্য থাকএ মাতার শরীরে।
আর আপ[১১] দশরত্ন[১২] দেয়ন্ত[১৩] তাহারে॥
প্রথম মাসেত বিন্দু নির্মল নীর।
নিজ স্থানে পড়িআ থাকএ সুস্থির॥
বিভোল[১৪] হৈআ সেহি থাকে আপন মনে।
চলাবুলা[১৫] শরীরে নাঞি মাএ জানে॥
দ্বিতীয় মাসেত হএ দুগ্ধের সমানে।
আপন আদ্যন্ত লৈআ মাএ ভালে জানে[১৬]॥
চলিআ[১৭] বেড়াএ ঘন ঘন দেএ পাক।
স্থির না মানে জেন কুমারের চাক।।

তদতিরিক্ত চর্মের উপর যত কাল রঙের লোম (রোম) আছে, তাহাও মায়ের দ্রব্য।

১১. আপ— প্রভু নিরঞ্জন; সম্মানার্থে 'আপ'<অপ্প<আত্মন্ (সং.)

১২. দশরত্ন—পরবর্তী অধ্যায়ে এই 'দশরত্নের' পরিচয় দ্রষ্টব্য।

১৩. দেয়ন্ত— মধ্য বাংলায় ও প্রাচীন বাংলায় কর্তৃপদের গৌরবদ্যোতক -'অন্তি, -এন্তি' হইতে-'অন্ত'; যেমন 'করেন্ত', 'বোলেন্ত,' 'দেয়ন্ত'। বহু-বচনেও-'অন্ত' প্রত্যয়ান্ত পদ দেখা যায়। ইহা প্রাচীন সংস্কৃত প্রভাব।

১৪. বিভোল— শব্দটি 'বিহ্বল'। সং. বিহ্বল>বিভোল (হ+ব=ব+হ=ভ) বা বিভোর (ল=র)।

১৫. চলাবুলা— চলিয়া বেড়ানো; চলা ফেরা।

১৬. মাএ ভালে জানে—মা ভাল করিয়া জানে। লক্ষণীয় 'ভালে' শব্দের ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহার। সংস্কৃতের ক্রিয়া-বিশেষণে ব্যবহৃত দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রভাবে বাংলা 'এ' বিভক্তি ব্যবহৃত; যেমন—'ধীরে চল,' 'আস্তে বল' ইত্যাদি। কিন্তু, বর্তমানে 'ভালে' ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় না; বরং ব্যবহৃত হয় 'কপালে' অর্থে।

১৭. চলিআ - - - - চাক—দ্বিতীয় মাসে পিতৃ-বীর্য মায়ের গর্ভাধানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও ঘন ঘন পাক দিতে থাকে। এই পাক দেওয়ার ব্যাপারটি যেন কুমারের চাকের পাক খাওয়ার অনুরূপ। তুলনীয়:

নাভিরন্ধ্রে তদা দেবি। ভ্রাম্যতে চ সমীরণৈঃ।
কুম্ভকারো যথা চক্রে ঘটতে চ ঘটাদিকম্॥

(জ্ঞানভাষ্য তন্ত্র)

অর্থাৎ

হে দেবি। কুম্ভকার যেরূপ চক্রের উপর ঘটাদি বস্তু নির্মাণ করে, বায়ুও তদ্রূপ নাভিরন্ধ্রে (গর্ভে) ঘূর্ণায়মান অবস্থায় জীবদেহ নির্মাণ করে।

তৃতীয় মাসেত মার শরীর ভরে রজে[১৮]।
চারি ভিতে[১৯] রক্ত বেড়া বিন্দু থাকে মাঝে ॥
চারিভিতে রক্তএ টানিআ করে জড়।
ফিরিআ ফিরিআ সে আপনে করে দঢ়[২০] ॥
চতুর্মাসেত দেহ জন্মে স্থানে স্থান।
একে একে হএ সব দেহের নির্মাণ ।।
দিনে দিনে জেন দেহ বাঢ়এ[২১] নব ইন্দু।
তেন রূপে শরীরে বাঢ়িআ জাএ বিন্দু[২২] ॥

পঞ্চ মাসে শরীরে আসিআ বৈসে জিউ[২৩]।
লাড়ির[২৪] সঙ্গমে[২৫] মায়ের সত্তা[২৬] (হৈতে) পিউ[২৭] ॥
লড়িআ[২৮] বেড়াএ সে না হইআ মুগ্ধ[২৯]।
পঞ্চ মাস গর্ভ হৈলে জন্ম লএ দুগ্ধ ॥

---

১৮. তৃতীয় ----রজে—তৃতীয় মাসে গর্ভধারিণী মাতার শরীর রক্তে ভরিয়া উঠে। এই রক্ত বন্ধ ঋতুস্রাবের রক্ত।

১৯. ভিতে—দিকে। 'চারিভিতে'=চারি দিকে, চারি পার্শ্বে।

২০. দঢ়—দৃঢ় > দঢ় > দড়।

২১. বাঢ়এ—বাড়িয়া যায়। ব্যুৎপত্তি—সং. বর্ধতে > বড্ঢএ > বাঢ়এ > বাঢ়ে > বাড়ে।

২২. বিন্দু—বীর্য, চন্দ্র।

২৩. জিউ--প্রাণ ; দেহধারী আত্মা। সং. জীব > জীওঅ > জীউ, জিউ।

২৪. লাড়ির—নাড়ীর। (ল=ন, যেমন নেবু=লেবু ; ল-হাটা = ন-হাটা)

২৫. সঙ্গমে—সংযুক্তিতে ; সংযুক্ত থাকায়।

২৬. সত্তা—সত্তা, অস্তিত্ব। এখানে—'শরীর'।

২৭. পিউ—পান করে। ক্রিয়াপদ—সং. √পা ; √পী (পান করা) ; পীবতি > পি(পী)অই > পিএ (পান করে)। ছন্দের খাতিরে অর্থাৎ অন্ত্যানুপ্রাস ঘটাইবার জন্য '-এ'= '-উ'।

২৪-২৭. লাড়ির ----পিউ—ভ্রূণের গর্ভাবস্থায় মাতা যাহা পানাহার করেন, ভ্রূণ তাহা পানাহার করিয়া বাঁচে। মাতৃসত্তা হইতেই নাড়ীর সংযোগ সূত্রে এই কাজ চলে।

২৮-২৯. লড়িআ ----মুগ্ধ—ভ্রূণ (সে) মোহগ্রস্ত না হইয়া নড়া চড়া করে।

শ্রধা[৩০] করে মনুষ্যে (সৃ)জেন করতার[৩১]।
পঞ্চ মাস আগু[৩২] সৃষ্টি করএ আহার ॥[৩৩]
ছয় মাস যদি হএ গর্ভের প্রচার[৩৪]।
হৃদয় আনিআ দেহে করএ সঞ্চার ॥
হাথ পাও নাক[৩৫] চক্ষু সব লৈআ জন্ম।
দিনে দিনে খেনে খেনে বাড়এ কলম্ব ॥
সাত মাসে সাত ভাও[৩৬] হএ জায় কায়া।
জন্মিতে লাগিল শরীরে বিষ্ণুমায়া[৩৭] ॥
নিজ দ্রব্য দেএ গোসাঞি জেখানে জেবা সাজে।
মাসে মাসে দেএ সব শরীরের মাঝে ॥

অষ্ট মাসে অষ্ট-অঙ্গ[৩৮] সব হএ দঢ়।
লড়িআ চড়িআ বেড়াএ করে ধরফর ॥
নাড়ির সত্বা পিআ[৩৯] নিত্যি বাড়ে অঙ্গ।
রূপরেখ[৪০] আসিআ তাহে হএ সৎসঙ্গ[৪১] ॥

৩০/৩১. স্রধা ---- করতার—আগ্রহভরে (শ্রদ্ধা ভরে) প্রভু করতার মানুষকে সৃষ্টি করেন। স্রধা=শ্রদ্ধা>সদ্ধা>সাধ (খাওয়ানো)।

৩২. আগু— আগে, পূর্বে। সং. অগ্র>অগ্গ>আগ+উ=আগু

৩৩. পঞ্চ ---- আহার—সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার পাঁচ মাস আগেই স্রষ্টা মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করেন, যেন নবজাতক এই দুগ্ধ পান করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারে। মাতৃদুগ্ধ সন্তানের জন্য অমৃত স্বরূপ।

৩৪. প্রচার— প্রকাশ, অভিব্যক্তি।

৩৫. 'নাক'- শব্দ সংস্কৃত 'নাসিকা'-শব্দ হইতে বিবর্তিত নহে। কেননা, ইহা প্রচলিত বিবর্তন-ধারার বিরোধী। ইহা অনুমিত প্রা. আ. ভাষার 'নস্ক'-শব্দ হইতে বিবর্তিত, যথা—নস্ক>প্রা. নক্ক>বা. নাক। এই শব্দ হইতে সংস্কৃতের 'নাসিকা'-শব্দও গঠিত।

৩৬. ভাও— হালচাল, অবস্থা। সং. ভাব>ভাওঅ>ভাও।

৩৭. বিষ্ণুমায়া— বিষ্ণুর মায়া। বিষ্ণু=পরমেশ্বর; মায়া=ঐশী শক্তি। সুতরাং, 'বিষ্ণুমায়া' শব্দের অর্থ হইল—পরমেশ্বরের শক্তি।

৩৮. অষ্ট-অঙ্গ—দেহের অষ্ট অবয়ব; যথা—দুই হস্ত, দুই চক্ষু, হৃদয়, কপাল, কণ্ঠ ও মেরুদণ্ড। মতান্তরে—পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, দুই হাঁটু, দুই হস্ত, বক্ষ ও নাসিকা।

৩৯. নাড়ির সত্বা পিআ—নাড়ীর অস্তিত্বের সাহায্যে পান করিয়া।

৪০. রূপরেখ—মূর্তি; গঠন।

৪১. সৎসঙ্গ—শুভ-মিলন।

নয় মাস উর্ধে জদি হএত প্রচার।
বারি হও[৪২] হও করি আইসে সে দুয়ার॥
এখন তখন করি সেই মাস থাকে।
অন্ধক[৪৩] শরীর লাজে আগল[৪৪] দিআ রাখে॥
দশ মাস হৈলে দেহ হএত পাকল[৪৫]।
ঘুচাইয়া পেলাএ[৪৬] সব চক্ষের বাকল[৪৭]॥

জে দিবসে বালকের চক্ষু গিআ ফুটে।
লাড়ীর গাঁঠি[৪৮] সব আপে আপে[৪৯] ছুটে॥
জেহি পথে জাএ সেই সেহি পথে আইসে[৫০]।
আপনাকে দিআ দড় করে দশ মাসে॥
আসিবার[৫১] সময় রহিতে আর নাঞি।[৫১]
হেন বেলায় আজ্ঞা করেন গোসাঞি॥

---

৪২. বারি হও—বাহির হও। সং. বাহির>বাইর>বারি (বর্ণ বিপর্যয়ে-ইর=রই=রি লক্ষণীয়)

৪৩. অন্ধক— অন্ধ+(স্বার্থে)-ক=অন্ধক=আঁধা, পথ দেখিতে অক্ষম। গর্ভস্থ শিশুর তখনও চক্ষু ফুটে নাই বলিয়া, সে বাহির হইবার পথ দেখিতে অক্ষম।

৪৪. আগল— বাধা, প্রতিবন্ধক। সং. অর্গল>অগ্‌গল>আগল। গর্ভস্থ শিশু বাহির হইবার পথ দেখিতে পায়না বলিয়া লজ্জায় নিজের শরীরকে আগলাইয়া রাখে।

৪৫. পাকল—পাকা, পরিপক্ক সং. পক্ক>পক্‌ক>পাক+(স্বার্থে) ল=পাকল।

৪৬. পেলাএ— ফেলায়। ব্যুৎপত্তি: সং. প্রেরয়তি>প্রা. (মাগ) পেল্লই>পেলে>ফেলে (প্রয়োজক—ফেলায়)।

৪৭. বাকল— চর্ম, ছাল। এখানে চক্ষু আবৃতকারী চর্ম।
সং. বল্কল>বক্‌কল>বাকল=ছাল (গাছের)।

৪৮. গাঁঠি— সং. গ্রন্থি>গন্‌ঠি>গাঁঠি=গিরা (নাড়ীর=লাড়ীর)।

৪৯. আপে আপে—আপনা-আপনি। সং. আত্মন্>প্রা. অপ্‌প>আপ+এ=আপে।

৫০. আইসে— আসে। সং. আবিশতি>আইসই>আইসে>আসে।

৫১. আসিবার সময় রহিতে আর নাই—ইহা একটি মধ্যযুগীয় বাংলা বাক্-রীতি। ইহার অর্থ হইল, 'আসিবার সময় অধিক বাকি নাই'। 'আর'=অধিক, বেশি। তুলনীয় (আধুনিক) 'রাতের বেলা একা যেতে নেই'।

ভোগ-উপভোগ[৫২] জথ করিব সংসারে।
সব আনিআ থোও[৫৩] উহার গোচরে॥
জে দিবস ভূমিষ্ট হইব সংসারে।
পুনরপি জে দিবস আসিব নিজপুরে॥[৫৪]

জথেক খাইব দ্রব্য আর জলপান[৫৫]।
পরিবার[৫৬] আন[৫৭] জথ করিআ নির্মাণ॥
ভোগ-উপভোগ জথ কম্মে[৫৮] আছে লেখা[৫৮]।
দুখ সুখ সব উহারে লৈআ দেখা॥
দিনে দিনে জথ দ্রব্য পরে আর খাএ[৫৯]।
হাথে করি তাহারে সব জে দেখাএ[৬০]॥

---

৫২. ভোগ-উপভোগ—শব্দ দুইটি সচরাচর এক অর্থ বুঝাইলেও, ইহারা একার্থবহ নহে। 'ভোগ' শব্দে কোন বস্তুর একক ব্যক্তিগত অনুভূতি বা স্বকীয় স্বার্থে সম্পদের ব্যবহার বুঝায় এবং 'উপভোগ' শব্দে পুত্র-কলত্রাদির অথবা বন্ধু-বান্ধব অনেকের সহিত সুখ-সম্পদের সম্ভোগ বুঝায়।

৫৩. থোও— মধ্যম পুরুষে ক্রিয়ার রূপ (অনুজ্ঞায়)। সং. √স্থা=বাং. √থু+ও (অনুজ্ঞায়)=থুও>থোও (স্বরসাম্যে)।

৫৪. পুনরপি - - - নিজপুরে—এই বাক্যে মুসলমানদের একটি মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তাহা এই—মৃত্যুর পর মানুষ ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করে। এই লোকে মানুষকে অনন্ত কাল বাস করিতে হইবে। ইহাকে আল্লার খাস রাজ্য বলিয়া মনে করা হয়। এই কারণেই কাহারও মৃত্যু সংবাদ শুনিলে মুসলমানেরা কোরান-শরীফের কথায় বলিয়া থাকেন "ইন্না লিল্লাহি ব্ ইন্না ইলৈহি রাজিউন্" [নিশ্চয় আমরা আল্লার জন্য এবং (মৃত্যুর পর) নিশ্চয় আমরা তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইব।] অতএব, পরলোকই মুসলমানের 'নিজপুর' বা চিরন্তন বাসস্থান।

৫৫. জলপান— ইহার অর্থ 'জলখাবার' নয়; বরং 'পানীয় দ্রব্য'।
জথেক - - - জলপান—যত আহার্য ও পানীয় দ্রব্য।

৫৬. পরিবার— পরিধান করিবার। তুল. সং. পরিধিয়তে>ম. বাং. পহে।

৫৭. আন— অন্যান্য। সং. অন্য>অন্ন>আন=অপর

৫৮/৫৮. কম্মে আছে লেখা—'কম্মে' অর্থাৎ 'কর্ম' নামক 'আড়াই অক্ষরে' যাহা কপালে লেখা আছে। বিস্তৃত জ্ঞাতব্যের জন্য 'তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৯. খাএ— খায়। সং. খাদতি>খাঅই>খাএ>খায়।

৬০. দেখাএ— দেখানো হয়। মূল—সং. 'দ্রক্ষতি' হইতে 'দেখে' এবং 'দেখে' হইতে বাংলা নিজস্ব 'দেখায়'<দেখাএ।

দেখাইআ পুনর্বার পেলাএ সংসারে।
কর্মগতি[৬১] জার যেহি সেহিখানে পড়ে॥
কর্মের ফলে কেহো পড়ে একঠায়।
বসি ভোগ করে সে কোথা নাঞি জায়॥
পেলাইবার বেলা কেহ পড়ে ছড়াইআ।
দেশে দেশে বেড়াএ সে আহার করিআ॥
জেদিন[৬২] জেখানে জার আহার পড়ি থাকে।
জেকোন প্রকারে গোসাঞি লৈআ জায় তাকে॥[৬২]

আপনার মায়া[৬৩] গোসাঞি আপে ভালে[৬৪] জানে।
আহার করাএ সেহ জেখানে সেখানে॥
জথ দ্রব্য ছড়াইআ পেলায় সংসারে।
বাহির করিআ দেহ করৌক[৬৫] আহারে॥

---

৬১. কর্মগতি— কপালের লিখা কর্ম অনুসারে যাহাকে যেখানে যাইতে হইবে, সেখানে সে যাইবে ও আহার্য ও পানীয় সংগ্রহ করিবে।

৬২/৬২. জেদিন - - -জায় তাকে—এক এক দেশের এক এক জায়গায় মানুষের জন্য পানাহার নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। যাহার পানাহার যেখানে থাকে, নিরঞ্জন গোস্বামী সেই আহার্য গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে সেখানে লইয়া যায়; তাহা যে-কোন প্রকারেই হউক না কেন। ইহাতে সূফী কবি শেখ সাদীর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের প্রতিধ্বনি রহিয়াছে,—

دوچیز آدمی را کشد زور زور —
یک آب دانه دیگر خاک گور +

অর্থাৎ

দুই বস্তু মানুষকে সজোরে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া আনে: তাহার একটি আহার্য (আবদানা) এবং অপরটি কবরের মাটি।

৬৩. মায়া— এখানে 'মায়া' ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের 'অবিদ্যা', 'অজ্ঞান' প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইল—'পরমেশ্বরের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি'। প্রকৃত পক্ষে যাহা সাংখ্য-দর্শনের 'প্রকৃতি', তাহাই বেদান্ত-দর্শনের 'মায়া'। "Māyā does not mean illusion, as some scholars think; but it is that power which produces time, space and causation, as also the phenomenal appearance which exists on relative plane." (Quoted by Bengali lexicographer Gnānendra Mohan Das)

৬৪. ভালে জানে—ভালভাবে জানে। দ্বিতীয় অধ্যায়; ৫০ পৃ. দ্রষ্টব্য।

৬৫. করৌক—করুক। ব্যুৎপত্তি—সং. করোতু > করউ (প্রা.) > করউ + (স্বার্থে) -ক = করউক > করৌক > (আধু.) করুক।

ভূমিষ্ঠ হইআ জবে চক্ষু খুলি চাএ[৬৬]।
আহারের জত দ্রব্য দেখিতে ন পাএ[৬৭]॥
ব্যাকুল হইয়া মনে গণএ আপার[৬৮]।
উংঞা-উংঞা[৬৯] করিআ কান্দএ তিনবার॥
হাথ[৭০] পাও[৭১] আছারিআ[৭২] ভাবে মনে ব্যথা।
আছিলাও কোন স্থানে আইলাও কোথা॥
আহার দেখিআ বাহির হএ জে আনন্দে।
ভূমিষ্ঠ হৈআ ন দেখিল তে কারণে কান্দে॥

ফলে ফুলে তুষ্ট জদি হএত বালক।
মহা হরষিত হএ রবতে রবক[৭৩]॥
জাইতে বাপের মানি[৭৪] আসিতে হএ পুত।
তেকারণে নাম ধরে গোর্খ[৭৫] অবধুত[৭৬]॥

---

৬৬. চাএ— চায়, দেখে। সং, চক্ষতি>চক্‌খই>চাখই>চাহই>চাহএ>চাঅএ>চাএ>(আধু.)চায়।

৬৭. পাএ— পায়। সং. প্রাপতি>পাঅই>পাএ>(আধু.)>পায়।

৬৮. আপার— অপার, অসীম, দুস্তর। লক্ষণীয় আদ্য 'অ'='আ' যেমন, আনল=অনল।

৬৯. উংঞা-উংঞা—উঙা-উঙা=শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তিনবার এই ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া কাঁদে।

৭০. হাথ—হাত। সং. হস্ত>হথ>হাথ>হাত।

৭১. পাও— ঠ্যাং। সং. পাদ>পাঅ>পাও>পা

৭২. আছারিআ—মূল শব্দ বিশেষ্য পদ 'আছাড়'='আছার'। ইহা আরবী عثر= পা পিছলানো শব্দের বাংলা রূপ। এখানে নাম ধাতুরূপে ব্যবহৃত।

৭৩. রবতে রবক—ইহার অর্থ বুঝা গেল না। পাঠ শুদ্ধ কি না কে বলিবে?

৭৪. মানি— শব্দটি আরবী 'মনী'=বীর্য, বিন্দু, চন্দ্র।

৭৫. গোখ— গোরক্ষ নাথ। নেপালে প্রচলিত একটি অলৌকিক কাহিনী, যাহা গোরক্ষনাথের জন্ম বৃত্তান্ত হিসাবে প্রচলিত আছে, এখানে তৎপ্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই কাহিনী অনুসারে পুত্রাকাঙ্ক্ষিণী এক নারী শিবের নিকট তাঁহাকে একটি পুত্র সন্তান দান করিতে বর প্রার্থনা করিলেন। শিব তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে কিছু ভস্ম প্রদান করিয়া তাহা খাইতে বলিলেন। কিন্তু নারী তাহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া উপেক্ষা

ভূমিষ্ঠ হইলে বালক করিআ জতন।
আপনি গোসাঞি দেএ দশহি রতন॥
শেখ জাহেদ কহে গর্ভের[৭৭] বিচার[৭৮]।
শরীরেত দশ রত্ন দেএন্ত করতার॥

ভরে ইহাকে নিকটবর্তী এক গোময়-স্তূপে নিক্ষেপ করেন। ইহার বার বৎসর পর শিব তথা হইতে গোরক্ষ নাথকে আবিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি গোপগণ কর্তৃক প্রতিপালিত ও রাখালরূপে গো (গরু) রক্ষার কাজে নিয়োজিত হইয়া বড় হইয়াছিলেন।

৭৬. অবধূত— সংসারের মায়া হইতে মুক্ত সন্ন্যাসীদিগকে 'অবধূত' বলা হয়। 'অবধূত' নামক সন্ন্যাসী প্রধানতঃ দুই প্রকারের হইয়া থাকে,— শৈব ও বৈষ্ণব। 'মহানির্বাণ-তন্ত্রে' শৈব অবধূতগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আবশ্যকবোধে তাহা পাঠ করিয়া দেখা যায়।

৭৭/৭৮. গর্ভের বিচার—গর্ভধারণ তত্ত্ব বা বর্ণনা। এই অধ্যায়ে সন্তানের গর্ভধারণ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত যেই সমস্ত তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত কোরান-পুরাণে বর্ণিত নানা তথ্যের মিল দেখা যায়। তুলনামূলকভাবে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য নিম্নে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হইল :

(ক) কুর্‌আন্—সূরা মু'মিনূন্

১২. ব্ লকদ খলক্‌না-'ল্-ইন্‌সান মিন্ সুলালতি-ম্-মিন্ ত্বীনিন জি ০

১৩. থুম্ম জ'অল্‌নাহু নুত্‌ফতান্ ফী করারি-ম্-মকীনিন্ ০

১৪. থুম্ম খলকনা—'ন্-নুত্‌ফত 'অলকতান্ ফ-খলক্‌না-'ল্-'অলকত মুধ্‌ধতান্ ফ খলক্‌না 'ল্-মুধ্‌ধত 'ইজামান্ ফ-কসৌনা-'ল-'ইজাম লহ্‌মান ক থুম্ম 'অন্‌শানাহু খল্‌কান আখর ত্ব ফতবারিক-'ল্-লাহু 'অহ্‌সনু-'ল্-খালিকীন ত্ব ০

অনুবাদ

১২. এবং নিশ্চয় আমরা মানবকে নির্বাচিত মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছি ;—

১৩. অতঃপর, আমরা তাহাকে শুক্রবিন্দুরূপে পরিণত করিয়া এক সংরক্ষিত স্থানে স্থাপিত করিয়াছি ; [ধারাবাহিক]

১৪. অনন্তর, আমরা শুক্রবিন্দুকে ঘনীভূত বস্তুতে পরিণত করিয়াছি, তৎপর ঘনীভূত বস্তুকে মাংস-পিণ্ডে পরিণত করিয়াছি, তাহার পর মাংসপিণ্ডকে অস্থিপুঞ্জে পরিণত করিয়াছি, অতঃপর অস্থিপুঞ্জকে মাংসল করিয়াছি, পরিশেষে উহাকে চরম-সৃষ্টিতে পরিণত করিয়া দিয়াছি ; অতএব ধন্য সেই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

(খ) নিরুক্ত, চতুর্দশ অধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ড।
যাস্ক

কথমিদং শরীরং পরং সংযম্যতে সৌম্যে ভবত্যেকারাত্রোষিতং কললং ভবতি, পঞ্চরাত্রাদ বুদ্বুদাঃ, সপ্তরাত্রাৎ পেশী, দ্বিসপ্তরাত্রাদর্বুদঃ, পঞ্চবিংশতি রাত্রঃ স্বস্থিতো ঘনো ভবতি। মাসমাত্রাৎ কঠিনো ভবতি ; দ্বিমাসাভ্যন্তরে শিরঃ সম্পদ্যতে ; মাসত্রয়েণ গ্রীবাব্যাদেশো, মাস চতুষ্কেণ ত্বগব্যাদেশঃ, পঞ্চমে মাসে নখরোমব্যাদেশঃ, ষষ্ঠে মুখনাসিকাক্ষিশ্রোত্রং চ সম্ভবতি, সপ্তমে চলন সমর্থো, ভবত্যষ্টমে বুধ্যব্য বস্যতি, নবমে সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণো ভবতি।

সরলার্থ

কিরূপে এই শরীর সংগঠিত হয়, যাস্ক তাহাই বলিতেছেন,—(গর্ভাধানের) প্রথম রাত্রিতে (শুক্র) 'কলল' (বিন্দুর) আকার, পঞ্চম রাত্রি হইতে 'বুদ্‌বুদ্'-আকার, সপ্তম রাত্রি হইতে 'পেশী'-আকার, দ্বিসপ্ত (চতুর্দশ) রাত্রি হইতে 'অর্বুদ'-আকার, পঞ্চবিংশতি (পঁচিশ) রাত্রি হইতে (আত্মার অনুপ্রবেশ হেতু) ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। একমাস হইতে (শুক্র ক্রমশঃ) কঠিন হইতে থাকে ; দুই মাসের মধ্যে মস্তক উৎপন্ন হয় ; তিন মাসে গ্রীবা, চারি মাসে ত্বক্, পাঁচ মাসে নখ ও রোম (এবং) ষষ্ঠ মাসে মুখ-নাসিকা-চক্ষু-কর্ণ জন্মে। সপ্তম মাসে চলন (স্পন্দন)-সামর্থ্য দেখা দেয়। অষ্টম মাসে বুদ্ধি জন্মে এবং নবম মাসে গর্ভের অর্থাৎ ভ্রূণের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা লাভ করে।

পঞ্চম অধ্যায়

দশরত্ন বিচার

॥ দীর্ঘ ছন্দ ॥

শ্রী রাগ

আপনার দশরত্নে দেন গোসাঞি মহাজত্নে
স্থানে স্থানে যেখানে জা সাজে[১]।
প্রথমে বচন[২] দিল রচন করিআ থুইল
বড় দ্রব্য[৩] শরীরের মাঝে[৪] ॥
জদি ন মেলএ[৫] মুখ কেহো নাঞি পাএ[৬] সুখ
বচন ন হৈলে নহে কিছু।
দুই রত্ন নিরমিল সুনিতে শ্রবণ দিল
আর জত নিমিল সব পিছু ॥
তৃতীয় নাসিকা কৈল মহাযত্নে নির্মাইল
তার মধ্যে[৭] নির্মল সুগন্ধ।[৮]
নানান গন্ধ চন্দন কত কত পুষ্পবন
সব লৈআ প্রকার[৯] প্রবন্ধ[১০]।। [১১]

---

১. সাজে— শোভা পায়। সং. সসৃজতি>সজ্জই>সাজই>সাজে।

২. বচন— মুখ=বাক্‌শক্তি

৩. বড় দ্রব্য— বাক্‌শক্তি স্ফূর্ত হইবার জন্য বড় বস্তু 'মুখ'।

৪. শরীরের মাঝে—মানব-শরীরে 'মুখ' একটি অতি বড় বস্তু।

৫. মেলএ— খোলে। সং. মিলতি>মিলই>মিলে>মেলে(স্বরসাম্যে)।

৬. পাএ—প্রাপ্ত হয়। সং. প্রাপতি>পাজই>পাএ>পায়।

৭. মধ্যে—এখানে 'মধ্যে' শব্দ 'সাহায্যে' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৮. তার মধ্যে নির্মল সুগন্ধ—নাসিকার 'মধ্য দিয়া' নির্মল সুগন্ধ লাভ করে।

৯. প্রকার—'প্রভেদ' অর্থে ব্যবহৃত। (বাংলা অভিধান—জ্ঞানেন্দ্র মোহন দেখুন)

১০. প্রবন্ধ—'উপায়' অর্থে ব্যবহৃত। (ঐ)

চতুর্থে দিল লোচন অতি বড় মহাধন
তাহে ভাল মন্দ সব দেখে[১২]।
জথ থাকে গোপত[১৩] সব করে বেকত[১৪]
দৃষ্টি হৈতে সব সেহ লখে[১৫] ॥
পঞ্চমে দিল ইমান[১৬] জাহে হএ মুসলমান
দীপ হেন শরীরেত জ্বলে।
উজ্জ্বল পসর[১৭] তার দূর করে অন্ধকার
প্রকাশ হএ তাহার উজ্জলে[১৮] ॥
ষষ্ঠমে[১৯] দিলেক বুদ্ধি সেহি বড় মহানিধি
তাহে ভাল মন্দ সব জানে।
হেতু উপায় করে দুদিনে পরিহরে
বুদ্ধি হৈতে চিত্তএ কল্যাণ ॥

---

১১. নানান গন্ধ----প্রকার প্রবন্ধ—বিবিধ গন্ধের চন্দন, পুষ্পবন প্রভৃতি যত সুগন্ধ-বস্তু আছে, তাহার সব কিছুর পার্থক্য বা প্রভেদ ঠিক রাখিয়া নাসিকাই গন্ধ গ্রহণের উপায় (প্রবন্ধ) স্বরূপ।

১২. দেখে—সং. দ্রক্ষতি>দক্‌খতি>দক্‌খই>দেখই>দেখে।

১৩. গোপত—সং. গুপ্ত>গুপত (বিপ্রকর্ষে)>গোপত।

১৪. বেকত— সং. ব্যক্ত>বেকত (বিপ্রকর্ষে)

১৫. লখে— দেখে, লক্ষ্য করে। সং. লক্ষতে>লক্‌খতে>লখএ>লখে।

১৬. ইমান— আরবী শব্দ 'ঈমান' (ايمان)। 'মুস্‌লিম্' রূপে পরিগণিত হইতে সর্ব-প্রথম ও সর্বপ্রধান শর্ত হইল 'ঈমান' অর্থাৎ আল্লাহ্ (সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক) এক এবং হযরত মুহম্মদ আল্লাহ্-এর প্রেরিত পুরুষ —এই কথায় মনে-প্রাণে ও কাজে-কর্মে বিশ্বাস স্থাপন।

১৭. পসর— আলোক। বাংলাদেশে 'আলোক' অর্থে এখনও শব্দটি ব্যবহৃত হয়: ইহার অন্যান্য রূপ—পসর>পহর>পঅর>প'র (চট্টগ্রাম, নোয়াখালী)। সম্ভবতঃ শব্দটির ব্যুৎপত্তি এইরূপ—সং. প্র+√স্ফর্ (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ (তু)=প্রস্ফর>পস্‌সর>পাসর (?), পসর=জ্যোতি, দীপ্তি, আলো।

১৮. উজ্জলে— ঔজ্জ্বল্যে। বিশেষণ পদের বিশেষ্যরূপে ব্যবহার লক্ষণীয়।

১৯. ষষ্ঠম— ছয়ের পর্যায়। ক্রমবাচক 'ষষ্ঠ' শব্দের স্থলে 'ষষ্ঠম' শব্দের ব্যবহার মধ্যযুগের বাংলায় বিরল নহে, যেমন—"ষষ্ঠমে সেবক ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা" (যদুরাম চক্রবর্তী)। মধ্যযুগের বাংলায় 'ষষ্ঠম' শব্দের ব্যবহার সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক (Interesting)। ইহা যে 'পঞ্চম', 'সপ্তম,' 'অষ্টম,' 'নবম' ইত্যাদি ক্রমবাচক শব্দের

সপ্তমে দিল চেতন[২০] ই[২১] বড় মহারতন
জাহাতে বিভোল[২২] পরিহরে।
সদাএ চেতন সুখে কভু নাঞি পায় দুখে
চেতন হৈতে চিনে করতারে॥
অষ্টমে দিল জীবন ই বড় মহাধন
শরীরে করিল অধিকারে।
জাহাক জে আজ্ঞা করে সভে[২৩] খাটে[২৪] অগোচরে
তার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে ন পারে॥
নবমে রুহুএ[২৫] দিআ কথো ভাতি[২৬] নির্মাইয়া
রাখিল জে শরীর ভিতর।
সুগোচর[২৭] সব কম্ম সদাই চিন্তএ ধম্ম
একে একে করএ প্রচার॥[২৮]

সাদৃশ্যে গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাকে এই যুগের বাংলায় একটা (False Analogy) বা 'কৃত্রিম নজীরের' উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

২০. চেতন— চৈতন্য, সংজ্ঞা।

২১. ই— সং. ইদম্ > ইঅং > ইঅ > ই = এই

২২. বিভোল— বিহ্বলতা। বিশেষণ পদের বিশেষ্যরূপে ব্যবহার লক্ষণীয়।

২৩. সভ— সকল, সব। সং. সর্ব > সব্ব > সাব = সব = সভ ('ব'-এর মহাপ্রাণতায়)

২৪. খাটে— পরিশ্রম করে। ধাং. √খাট্ + এ (নাম পুং. বহুবচনের তিঙ্)

২৫. রুহু— 'রূহ্' (روح) শব্দ আরবী; তাহার সহিত কর্মকারকে -'এ' বিভক্তি যুক্ত হইয়া 'রুহুএ' শব্দ লিখিত। ইহার অর্থ 'আত্মা', 'প্রাণ', 'বিবেক'।

২৬. ভাতি— সং. √ভা (দীপ্তি পাওয়া) + ক্তি (ভা.) = ভাতি = দীপ্তি, আলো। শরীরে 'রূহ্' বা আত্মা প্রদত্ত হইলে পর, আরও বহু (কথো) দীপ্তিমান-বস্তু (ভাতি) নির্মাণ করিয়া প্রভু নিরঞ্জন শরীরের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

২৭. সুগোচর - - - - প্রচার—যেই সমস্ত কাজ গোচরে আসিলে উত্তম বলিয়া প্রতীয়মান (সুগোচর) হয় এবং ধর্ম-কর্ম বলিয়া প্রতিপালিত হয়, আত্মা বা বিবেক আছে বলিয়াই মানুষ তাহার সম্বন্ধে সর্বদা চিন্তা করে। এবং একটার পর একটা করিয়া তাহা সমাজে প্রচলিত করিয়া থাকে।

অ. কম্ম—সং. কর্ম > প্রা. কম্ম > কাম (তুল. 'যেমন নাম, তেমন কাম')।

দশমে আস্থ্যা[২৮] শরীর ইহাতে হএ জে থির[২৯]
নয় চিজ[৩০] আছে ওহার[৩১] মাঝে।
সব (চিজ) করি কোলে[৩২] আছে মহানন্দ হালে[৩৩]
রাখিল জেস্থানে জেবা সাজে॥
এহি সব রতন সার আপনে দেন করতার
তাহা সব বস্থ্যাইল[৩৪] স্থানে স্থানে।
এহিত শরীর মাঝে করিআ দিল সুসাজে
সব দিল আপন বিদ্যমানে॥
চারি দ্রব্য মাতার চারি দ্রব্য পিতার
গোসাঞির ই দশ রতন।
জথেক জনমে নর সব ইহার ভিতর
অষ্টাদশ দ্রব্যে শরীর উৎপন॥[৩৫]

আ. কাজ—সং. কার্য > প্রা. কজ্জ > কাজ (তুল. 'কাজ কাম নাই')।

ই. ধম্ম— সৎকাজ, পুণ্যকাজ। সং. ধর্ম > পালি. ধর্ম্ম (তুল. 'ধম্মং শরণং গচ্ছামি)।

২৮. আস্থ্যা— আসিয়া। ব্যুৎপত্তি—আ + √বিশ্ + ল্যপ্ = আবিশ্য > আবিস্য + আ = আবিস্যা > আস্থ্যা (?)।

২৯. থির— স্থির (বর্ণাদ্য সংযুক্ত ধ্বনির একটি লোপে)।

৩০. নয় চিজ— নয় বস্তু। 'চিজ' শব্দ ফার্‌সী چیز। এই নয় বস্তু শরীরস্থ নবদ্বার বা দশদ্বার বলিয়া মনে হইতেছে। তাহা এই রূপ—দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র, এক মুখ, এক পায়ু, এক উপস্থ এই নবদ্বার এবং এক ইন্দ্রদ্বার (অজ্ঞাত দ্বার;—ইহার মধ্য দিয়া প্রাণ দেহে প্রবেশ করে ও বাহির হইয়া যায়।) এই অধ্যায়ে বর্ণিত 'দশরত্ন' যোগশাস্ত্রোক্ত দশদ্বারের প্রভাবে কতখানি প্রভাবিত চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

৩১. ওহার—উহার। সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি—প্রাচীন আর্যভাষায় 'এতস্য' > 'এহা'; ইহা যেই প্রকারে উদ্ভূত হইয়াছে, তদ্রূপ *'অবস্য' একটি শব্দের অস্তিত্ব ছিল, যাহা হইতে *অবস্য > অপ. 'ওহ' শব্দের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। ইহার সহিত ষষ্ঠীর -'র' যুক্ত হইয়া 'ওহার' শব্দ প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

৩২. কোল— ক্রোড় ('ড়'='র'=মাগধী প্রাকৃতের প্রভাবে 'ল')।

৩৩. হালে—অবস্থায়। শব্দটি আরবী 'হাল' (حال)+এ।

৩৪. বস্থ্যাইল—বসাইল। 'আস্থ্যা' (আসিয়া) শব্দের মত 'বস্থ্যা'+ইল।

৩৫. চারি দ্রব্য---উৎপন—দ্বিতীয় অধ্যায়; ৪৪ পৃ. দ্রষ্টব্য।

শরীর উৎপত্তি কৈল　　আর কত নির্মাইল
তবে ঘট[৩৬] করিল প্রচার।
সংসারেত জথ দেখিল　　সব আনিআ থুইল
তাহাতে কৈল ই দশ দুয়ার॥
জাহেদ কহএ[৩৭] বাণী　　এত দিনে ভালে[৩৮] জানি
তাহা বিনু আর কেহো নাঞি।
মনুষ্যে করিতে সুখ　　বিধি কৈল এত দুখ
মায়াবন্ধ ন ছিল গোসাঞি॥[৩৯]

---

৩৬. ঘট— ইহা একটি পারিভাষিক শব্দ। 'আদ্য-পরিচয়' গ্রন্থের মত অধ্যাত্ম গ্রন্থে এবং বাউল ও দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গানে ইহা দেদার ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ যে 'দেহ', তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহাকে 'দেহ' না বলিয়া 'ঘট' বলিবার কারণ কি? কারণটি 'মধুসূদন সংহিতার' (১৩।২৭) নিম্নোৎকলিত শ্লোকে পাওয়া যাইবে:

"প্রাণাপান নাদবিন্দু জীবাত্ম পরমাত্মনঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাৎ তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে॥"

অর্থাৎ

যে আধারে প্রাণ, অপান, নাদবিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটে, তাহাই 'ঘট' নামে পরিচিত।

৩৭. কহএ— কহে, বলে। সং. কথয়তি>কহঅই>কহই>কহএ>কহে।

৩৮. ভালে— পূর্বে দ্রষ্টব্য (ক্রিয়া-বিশেষণে '-এ' লক্ষণীয়)

৩৯. মনুষ্যে - - - - গোসাঞি—মনুষ্যকে সুখ দান করিতে বিধাতা কত দুঃখ যে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি মায়ের চারিটি বস্তু, পিতার চারিটি দ্রব্য এবং তাঁহার নিজের দশটি রত্ন দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি সংসারের বিবিধ বস্তুও সৃষ্টি করিয়াছেন। এত কিছু করিয়াও স্রষ্টা তাঁহার সৃষ্টির মায়ায় আবদ্ধ হইয়া থাকেন নাই। তিনি সৃষ্টি হইতে পৃথক্ এবং সৃষ্টিতে নির্লিপ্ত অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির অতীত সত্তা (Transcendental Entity)—সৃষ্টিতে নিহিত সত্তা (Immanent Entity) নহেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দশ দ্বার বিচার[১]

॥ ক্ষিপ্র ছন্দ ॥

বরাড়ী রাগ

নরে[২] উত্তম ঘট[৩] করি সৃজিল করতার।
নানা রত্ন ভরিআ কৈল তাথে দশদ্বার[৪] ॥
প্রথমে বচনে কৈল এক (জে) দুয়ার।
কপাট[৫] ঘুচাইলে বারি[৬] হএ জে ভাণ্ডার ॥

---

১. এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'দশদ্বার' সম্বন্ধে বিচার বা আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং মনে হইতেছে, 'দশরন্ধ্র' ও 'দশদ্বার' পৃথক্‌ভাবে পরিকল্পিত। উভয়ের মধ্যে কয়েকটি নাম, যেমন—বচন, শ্রবণ, লোচন ইত্যাদি, —সাধারণ (Common) থাকায় মনে হইবে উভয়েই এক; ফলে তাহা নহে। 'দশরন্ধ্রের' দ্বারা মানব-শরীরে অন্তর্নিহিত দশটি শক্তি বা ক্ষমতা বা গুণ বুঝানো হইয়াছে এবং 'দশদ্বার' দ্বারা যোগশাস্ত্রীয় দশটি শারীরিক রন্ধ্রের কথা বলা হইয়াছে।

২. নরে— মানুষকে। লক্ষণীয়, কর্মকারকে -'এ' বিভক্তির ব্যবহার।

৩. ঘট—পারিভাষিক শব্দ। পূর্ব অধ্যায়ে 'ঘট'-এর পারিভাষিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

৪. দশদ্বার— এই গ্রন্থের মতে 'দশদ্বার' এইরূপ:

১. বচন=মুখবিবর।
২. শ্রবণ=কর্ণরন্ধ্র।
৩. নাসা=নাসারন্ধ্র।
৪. চক্ষু=অক্ষিবিবর।
৫. জিহ্বা=জলদ্বার।
৬. স্তন=দুগ্ধদ্বার।
৭. ত্বক্=স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বার।
৮. উপস্থ=কন্দর্প দ্বার।
৯. পায়ু=মলদ্বার।
১০. গুহ্যদ্বার=ইন্দ্রদ্বার।

জাবত মনুষ্য আপে ন মেলে বয়ানে[৭]।
মূর্খ পণ্ডিত তাহে কেহ নাঞি জানে ॥[৮]
দ্বিতীয় দুয়ার গোসাঞি করিল[৯] শ্রবণে।
অই দ্বার হৈতে নর সব কথা শুনে ॥

শব্দের দুয়ার অই নিরবধি[১০] সাজে।
ই দুয়ার ন হৈলে ন হৈত কোন কাজে ॥
তৃতীয় দ্বার নাসিকা[১১] করিল প্রবন্ধ[১২]।
জাহাতে উৎপত্তি হএ ভাল মন্দ গন্ধ ॥[১৩]
গন্ধ চন্দন বাস লএ অই পথে।
মহা উপভোগ ভুঞ্জে[১৪] অই দ্বার হৈতে ॥

---

৫. কপাট=কবাট (প=ব)—দ্বাররোধক পাল্লা (দ্রষ্টব্য—'কপাটঞ্চ কবাটকমিতি দ্বিরূপকোষ')। সম্ভাব্য বুৎপত্তি এইরূপ—ক(অর্থ-'বায়ু')+√পট্ (ণিচ্) =√ পাটি(গমন করানো) + অণ্= র্তৃ(বাচ্য)=কপাট অর্থাৎ বায়ু চলাচল করানোর পথ। পরবর্তীকালে বায়ু-চলাচলের রোধকারী কাঠের বা লৌহের পাল্লা।

৬. বারি—বাহির (সং.) বহিস্=বহিঃ=বাং. বাহির>বাইর>বারি (বর্ণ বিপর্যয়ে)।

৭. বয়ান— সং.বদন>বঅন>বয়ন(অ=য়-শ্রুতিতে)>বয়া (সম্ভবতঃ 'কাপড় বুনা'-র সংস্কৃত 'বয়ন' শব্দ হইতে পৃথক করিবার জন্য 'আ'-এর আগম হইয়াছে)।

৮. জাবত মনুষ্য- - -নাঞি জানে—যতক্ষণ মানুষ নিজে নিজে মুখ না খোলে অর্থাৎ কথা না বলে, ততক্ষণ সে ব্যক্তি মূর্খ, না জ্ঞানী, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। সংস্কৃত 'যাবৎ' প্রাকৃত বানানে 'জাবত' লক্ষণীয়।

৯. করিল— নির্মাণ করিল; গঠন করিল। সং.√কৃ=বাং.√কর্+ইল।

১০. নিরবধি—অবধি (=শেষ)-বিহীন, অসীম (নির্+অবধি—বহুব্রীহি) (বাং. —নিরবধি কাল; সং. মালতীমাধবে—'কালোহ্যয়ং নিরবধি)।

১১. নাসিকা—নাক। বাংলা 'নাক' সংস্কৃত 'নাসিকা' হইতে উৎপন্ন নহে। আর্য-দের মুখের ভাষায় ইহার অনুমিত রূপ ছিল 'নস্ক'। ইহা হইতে 'নসক' এবং 'নসক'-ই সংস্কৃত 'নাসিকা' রূপে গৃহীত হইয়া থাকিবে। 'নস্ক' প্রাকৃতে 'নক্ক' এবং বাংলায় 'নাক'।

১২. প্রবন্ধ—সং. প্র+√বন্ধ্ (=বাঁধা)+অল্+র্য (বাচ্যে)=পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বন্ধন, গঠন বা নির্মাণ করা। নির্মাণ, রচনা।

১৩. জাহাতে উৎপত্তি- - -গন্ধ—ভাল গন্ধ কি মন্দ গন্ধ,—মানুষের এই যে বোধ, তাহা নাসারন্ধ্রে বায়ুর সহিত প্রবেশ করিলে, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে।

১৪. ভুঞ্জে—সং.√ভুজ্=বাং.√ভুঞ্জ্=ভোগ করা।

চতুর্থে করিল চক্ষু রতন দুয়ার।
জে দুয়ার হৈতে নর দেখিল সংসার॥
চক্ষে দেখিআ করে সংসারের ধান্ধা[১৫]।
চক্ষু ন হৈলে হএ সব দ্বার বান্ধা[১৬]॥

*পঞ্চমে জলের দ্বার জিহবার তলে।
রাত্রি দিন নিরবধি ঢেউ[১৭] তাত[১৮] খেলে॥
ই দ্বার হৈতে হএ জলের প্রকাশ।
জল ন হৈলে ঘটে কিসের আর আস[১৯]॥*
ষষ্ঠমে[২০] করিল এক দুগ্ধের দুয়ার[২১]।
ভূমিষ্ঠ হইআ জাথে[২২] করএ আহার॥

---

১৫. ধান্ধা—শব্দটি 'হিন্দী' ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। কারণ বাংলায় 'ধন্ধ' শব্দ আছে (ধোঁকা, সন্দেহ প্রভৃতি অর্থে) 'ধান্ধা' শব্দ দেখা যায় না। বাংলায় ব্যবহৃত 'ধন্ধ' শব্দ, সংস্কৃত 'দ্বন্দ্ব' শব্দ হইতে উৎপন্ন; ইহার অর্থ—ধোঁকা, ধাঁধাঁ, সন্দেহ ইত্যাদি'। হিন্দী 'ধান্ধা' অর্থ—জীবন সংগ্রামে লিপ্ততা, জীবিকানির্বাহার্থে রোজগারের তলাস ইত্যাদি।

১৬. বান্ধা—অবরুদ্ধ, বন্ধ। মূলে শব্দটি 'ব্রহ্ম'। ইহা লিপিকর প্রমাদ। 'ব্রহ্ম' যে 'বান্ধা'='বাঁধা' তাহাতে সন্দেহ থাকা উচিত নহে।

* * পঞ্চমে - - - -কিসের আর আস—মানুষের শরীর যেই পঞ্চ উপাদান দ্বারা গঠিত (ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম=ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম), 'অপ্' বা 'জল' তন্মধ্যে অন্যতম। তখনকার দিনে লোক বিশ্বাস করিত, মানুষের শরীরে কেবল জিহ্বার সাহায্যেই জল প্রবেশ করে এবং এই জলের বা যে-কোন পানীয়ের স্বাদ গ্রহণে জিহ্বা অনন্য। এই জন্যই 'জিহ্বার' অপর নাম 'রসনা' বা রস গ্রহণের ইন্দ্রিয়। তাহার ফলে 'জিহ্বা' বা 'রসনা' হইতে সর্বদা জল বাহির হয়। জল ব্যতীত মানুষের বাঁচার কোন আশা নাই।

১৭. ঢেউ— তরঙ্গ (দেশী শব্দ; 'তরঙ্গ' সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ)

১৮. তাত— তাহা হইতে। অপাদান কারকে-'ত' বিভক্তি লক্ষণীয়। বাংলায় অপাদান কারকে কোন নির্দিষ্ট বিভক্তি নাই। 'হইতে', 'থেকে', 'চেয়ে', প্রভৃতি শব্দ যোগে, যাহাকে বাংলা ব্যাকরণে 'কারক অব্যয়' বলে, বাংলা-ভাষায় অপাদান কারক নিষ্পন্ন হয়। মধ্য বাংলায় অপাদানে -'ত' বিভক্তি ছিল, যেমন—'মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহি (কৃষ্ণকীর্তন)'। এই-'ত', 'তাত' শব্দের -'ত'। ইহার উৎপত্তি সংস্কৃত 'বনাৎ'+তঃ (প্রত্যয়)=বনাত্তঃ>প্রা. বনত্তো>বনত।

১৯ আস— আশ=আশা

২০ ষষ্ঠম— সংস্কৃত ও বাংলায় ব্যবহৃত পূরণবাচক (Ordinal) সংখ্যা 'ষষ্ঠ'-এর রূপ মধ্য বাংলায় 'ষষ্ঠম'-ও দেখা যায়। ইহা যে

এই দ্বার হৈতে নর পাএ বড় হিত।
দুগ্ধ ন হৈলে কিবা হৈত বিপরীত॥
সপ্তমে শরীর মাঝে পর্শইন্দ্র[২৩] দ্বার।
জেই দ্বার হৈতে লোক পাএত[২৪] সংসার॥

*অই দ্বার দিয়া বারি[২৫] হএ মন্দনীর[২৬]।
দ্বার বন্ধ হৈলে হএ অস্বস্ত শরীর॥
অষ্টমে কন্দর্প-দ্বার[২৭] হএ জে প্রচার।
জবে মানি[২৮] চলে-বুলে[২৯] জাএ ই দুয়ার॥
অই দ্বার হৈতে নরের হএত জন্ম।
অই দ্বার ন হৈলে ন হৈত কোন কম্ম॥
নবমে মলদ্বার করিল জেন মতে।
শরীরের মলা[৩০] বারি হএ অই পথে॥

'পঞ্চম,' - - - 'সপ্তম', 'অষ্টম', 'নবম', 'দশম' প্রভৃতি পূরণ বাচক সংখ্যার অনুরূপ ধ্বনি-সাম্যের ফলে গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাকে ভাষাতত্ত্বে (False Analogy) বা 'কৃত্রিম-নজীর' নামে চিহ্নিত করা হয়।

২১. দুগ্ধের দুয়ার—দুগ্ধদ্বার অর্থাৎ স্তন, মাই।

২২. জাথে—যাহা হইতে (যাতে)। অপাদান কারকে (থে>তে)। উৎপত্তির জন্য ২ সংখ্যক টীকা উপরে দ্রষ্টব্য।

২৩. পর্শইন্দ্রিয়—স্পর্শেন্দ্রিয় অর্থাৎ ত্বক্ বা চামড়া।

২৪. পাএত সংসার—স্পর্শ করিয়া সংসারকে লাভ করে অর্থাৎ সংসারের কোন্ বস্তু কি, তাহার বোধ জাগে।

** অই দ্বার- - - অস্বস্ত শরীর—'ত্বক্'-ইন্দ্রিয় (ত্বগেন্দ্রিয়) দিয়া ঘর্ম (মন্দনীর) বা শরীরের দূষিত জল বাহির হয়। শরীরের ঘর্ম বাহির না হইলে, মানুষ দৈহিক স্বস্তি বা শান্তি হারাইয়া ফেলে।

২৫. বারি— বাহির (এই অধ্যায়ের ৪ চতুর্থ চরণের 'বারি' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৬. মন্দনীর—শরীরের দুর্গন্ধময় জল অর্থাৎ 'ঘর্ম'।

২৭. কন্দর্প-দ্বার—কামদেবের প্রবেশ-দ্বার অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়। ইহাকে 'উপস্থ'-ও বলা হয়।

২৮. মানি— আরবী শব্দ منى=মনী বা বীর্য; শুক্র; Semen।

২৯. চলে-বুলে—চঞ্চল হইয়া উঠে অথবা চলাফেরা করে।
চলে—সং. চলতি>চলই>চলে।
বুলে—সং. √বল্ ধাতু সঞ্চলনে। √বলতি>বলই>বলে>বুলে।

অই দ্বার হৈতে শরীর থাকে সুখে।
দ্বার বন্ধ হৈল (যেই) বড় হএ দুখে ॥
দশমেত গূঢ়দ্বার[৩১] সংক্ষেপ সে বাট[৩২]।
আসিবার বেলায় আসে ঘুচাই কপাট[৩৩] ॥
পুনর্বার রাত্রি দিন থাকে কপাট দিআ।
জাইবার বেলাএ জাএ তাহাত[৩৪] পলাইআ ॥
*জাবৎ ঘটেত প্রাণ তাবৎ জে দয়া।
ছাড়িবার বেলাএ কিসের দয়ামায়া ॥ *

*পলাবার বেলায় ফিরিআ নাত্রি চাএ[৩৫]।
জেহি পথ ভাল দেখে সেহি পথে জাএ ॥*

---

৩০. মলা—সং. মল (=বিষ্ঠা)+আ (বিশিষ্টতা দানে)=মলা (বোধ হয় 'মর্দন করা' অর্থে 'মলা'-শব্দকে বাংলায় পৃথক্ করিতে গিয়া 'য়'-ধ্বনির আগম হইয়াছে 'ময়লায়')।

৩১. গূঢ়-দ্বার—রহস্যময় অজ্ঞাত দ্বার। এই দ্বার মানুষের অজ্ঞাত। তবে, মানুষ বুঝিতে পারে যে, এই পথেই মানব-শরীরে প্রাণ প্রবেশ করে এবং এই পথ দিয়াই শরীর হইতে প্রাণ বাহির হইয়া যায়। শরীরের এই দ্বারটি কোথায় অবস্থিত, সে-সম্বন্ধে কাহারও জানা নাই বলিয়াই, ইহাকে 'গূঢ়-দ্বার' বা 'অজ্ঞাত-দ্বার' বলা হইয়াছে। যোগ-শাস্ত্রে ইহার অবস্থান নির্দেশ করা হইয়াছে—"গুপ্ত সে দশম দ্বার ব্রহ্ম-রন্ধ্র-মূলে"। চর্যাপদ, কৃষ্ণকীর্তন, শূন্যপুরাণ, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে 'দশমদ্বারের' উল্লেখ আছে।

৩২. বাট—পথ। সং. বর্ত্ম>বট্ট>বাট।

৩৩. কপাট—দরজার পাল্লা।

৩৪. তাহাত—অপাদান কারকে-'ত'; তাহা হইতে। অপাদানে -'ত' বিভক্তির টীকা পূর্বে দ্রষ্টব্য।

* * জাবৎ ঘটেত---দয়ামায়া—দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ প্রাণের মায়া দেহের প্রতি এবং দেহের মায়া প্রাণের প্রতি অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে। আর যখন প্রাণ ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন কাহারও প্রতি কাহারও (অর্থাৎ প্রাণের প্রতি দেহের এবং দেহের প্রতি প্রাণের) কোন দয়ামায়া থাকে না।

* * পলাবার---পথে জাএ—শরীরে অবস্থিত প্রাণ (আত্মা) যখন দেহ ত্যাগ করা প্রয়োজন মনে করে, তখন তাহা কোন দিকে না দেখিয়া, দশটি দ্বারের যে-কোন একটি দিয়া পলাইয়া যায়, অর্থাৎ তাহা যেই পথে পলাইয়া যাওয়া ভাল মনে করে, সেই পথ দিয়া পলাইয়া যায়।

৩৫. চাএ— সং.√চক্ষ্=বাং. চাহা অথবা√চাখা। √চক্ষতি>চক্খতি>চাখই>'চাখে'>'চাহে'>চাএ।

ঘটের ঈশ্বর[৩৬] জবে জাএ[৩৭] পলাইআ।
শূন্য হইয়া ঘট[৩৮] থাকএ পড়িআ॥
ঘটে থাকিতে ঘটের কন্মে কাম[৩৯]।
ঘট ছাড়ি গেলে আর কেবা লএ[৪০] নাম॥

ঘট ছাড়িয়া জবে জাএ অন্য স্থানে।
গাড়ুক[৪১] জারুক[৪২] ঘট কেবা তাহা জানে॥
গন্ধুক[৪৩] সড়ুক[৪৪] ঘট তভু[৪৫] তারে জে।
গন্ধ-চন্দনে এড়[৪৬] তভু তারে সে॥

---

৩৬. ঘটের ঈশ্বর—শরীরের বা দেহের (ঘটের) অধিপতি প্রাণ। দেহের (ঘটের) অধিপতি ঈশ্বরই মানুষের জীবন-কাল ও সর্ববিধ কাজকর্মের নিয়ন্তা। মানুষ যখন প্রাণ ত্যাগ করে, তখন দেহ কাহারও কাছে সমাদৃত হয় না। এই প্রসঙ্গে 'গীতা'-র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি স্মর্তব্য :

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে হর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"
(১৮।৬১)

অর্থ

হে অর্জুন। মায়ার দ্বারা সকলকে যন্ত্রবৎ ভ্রমণ করাইয়া ঈশ্বর সকলের হৃদয়দেশে অবস্থান করেন।

৩৭. জাএ—সং. যাতি>যাই>যাএ=জাএ।

৩৮. ঘট— দেহ, শরীর।

৩৯. কাম— কাজ। সং. কর্ম>কম্ম>কাম (=কাজ)

৪০. লএ—লয়, নেয়। সং.√লভ্=বাং.√ল (=নেওয়া)+এ (প্রত্যয়)।

৪১. গাড়ুক— মাটিতে পুতিয়া ফেলুক। বাং.√গাড়্+উক্ (অনুজ্ঞায়)=গাড়ুক।
[দ্রষ্টব্য :— বাংলা 'গাড়্' ধাতু আরবী 'গার'=غار বা গর্ত শব্দ হইতে উৎপন্ন কিনা বিবেচ্য। এখানে গাড়া=মাটিতে পোতা বা 'কবর' দেওয়ার কথা স্মর্তব্য।]

৪২. জারুক— পোড়াইয়া জীর্ণ করা হউক অর্থাৎ দাহ করা হউক।
সং.√জৃ(জীর্ণ করা)=বাং.√জার্+উক (অনুজ্ঞায়)=জারুক।
গাড়ুক-জারুক—গোর দেওয়া হউক বা দাহ করা হউক।

৪৩. গন্ধুক—'গন্ধ' শব্দ 'নামধাতু' রূপে ব্যবহৃত। গন্ধুক—দুর্গন্ধ নির্গত হউক।

৪৪. সড়ুক— পূর্ববঙ্গে (সাবেক) যেমন 'ড়' বর্ণ 'র' রূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা এবং তৎসূত্রে লেখার রেওয়াজ, দেখা যায়, পশ্চিম বঙ্গেও

খণ্ড খণ্ড করহ[৪৭] ঘট জেবা[৪৮] লএ সুখ।
ঘট ছাড়িআ গেলে তাহে কিবা দুখ॥
পিণ্ডে অনুমান করি জাহেদে[৪৯] জে কয়।
দুই চক্ষু মুদিলে কেহো কারো নয়॥
ধন জন লোহ[৫০] মোহ সকল দুর্মতি।
চলিবার বেলা সঙ্গে গুরুর সঙ্গতি[৫১]॥

তেমন 'র' বর্ণ 'ড়' রূপে উচ্চারিত হইতে এবং তৎসূত্রে লিখিত হইতে দেখা যায়, যথা—মরা=মড়া। এই হিসাবে 'সড়ুক'='সরুক', যাহার অর্থ খসিয়া পড়ুক বা সরিয়া পড়ুক, অর্থাৎ দেহ হইতে মাংস খসিয়া বা সরিয়া পড়ুক। সরুক—সং. √সৃ (সরিয়া পড়া)= বাং. √সর+উক (অনুজ্ঞায়)।

৪৫. তভু—মধ্যযুগের বাংলায় ব্যবহৃত "কবহু, কবহুঁ, তবহু, তবহুঁ, সবহু" প্রভৃতি বিবর্তিত হইয়া "কভু, তভু, সভে" রূপ ধারণ করিয়াছে।

৪৬. এড়—সং. √ইড্=বাং. √এড্+অ(অনুজ্ঞায়)=এড়—ছাড়িয়া দাও, যাইতে দাও; রাখিয়া দাও।

৪৭. করহ— তুমি কর (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

৪৮. জেবা লএ সুখ—যাহা করিয়া মনে সুখ পাও।

৪৯. জাহেদে— কর্তৃকারকে-'এ' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। বিভক্তিটি সং. -এন >প্রা.-এণ>অপ. -এঁ>প্রা. বাং. -এঁ>ম. বাং. -এ>আ. বাং.-এ হইয়াছে।

৫০. লোহ—সং. লোভ>প্রা. লোহ>ম. বাং. লোহ।

৫১. সঙ্গতি—মূল অর্থ হইল 'মিলন', সাহচর্য। সং. সম্+√গম্+ক্তি=সঙ্গতি। বর্তমানে অর্থ পরিবর্তনে (Semantic Change) ইহার অর্থ 'আর্থিক যোগ্যতা'। 'গুরুর সঙ্গতি'—গুরুর সাহচর্য, গুরুর সহিত মিলন।

সপ্তম অধ্যায়

দেহতত্ত্ব-বিচার[১]

॥ দীর্ঘ ছন্দ ॥

দেশাগ রাগ

ঘট উৎপত্তি কৈল আর কত নির্মাইল
ভরিল অমূল্য রত্ন দিআ।
জেখানেত জেবা সাজে সব দিল দেহ মাঝে
একে একে শোভন করিআ॥
প্রথমে ত্রিলোক[২] দিল স্বর্গ মর্ত্য পাতাল
তাহাতে তরএ[৩] রক্তঘোড়া[৪]।
বাউ[৫] লপন[৬] মাজা[৭] করে দেহ সুসাজা[৮]
শরীরে ইহার লড়াচড়া[৯]॥

---

১. এই সপ্তম অধ্যায়ে 'ঘটতত্ত্ব' অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধীয় তত্ত্বকথা আলোচিত হইয়াছে। পাত্রের মধ্যে যেমন করিয়া লোক মূল্যবান জিনিস-পত্র সযত্নে রাখিয়া দিয়া আশ্বস্ত হয়, ভগবান বা ঈশ্বর বা খোদা দেহকে ঘটের (পাত্রের) আকারে নির্মাণ করিয়া তাহাতে বহু অমূল্য রত্ন, যেমন—বাক্‌শক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, আস্বাদন-শক্তি, দুগ্ধদান-শক্তি, স্পর্শন-শক্তি, যৌন শক্তি, মলত্যাগ-শক্তি, অজ্ঞাত-শক্তি প্রভৃতি যেখানে যাহা আবশ্যক, তাহা দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এখানে পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত 'দশ-রত্নের' প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে।

২. ত্রিলোক— স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই ত্রিলোক শরীরে অবস্থিত আছে। 'শিবসংহিতায়' দেখা যায়:

"ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে॥" অর্থাৎ 'ত্রিলোকে যে-সকল পদার্থ যেভাবে আছে, দেহে তৎসমুদয় দ্রব্য সেইভাবে আশ্রয় করিয়া থাকিয়া নিজ নিজ কার্য নির্বাহ করিতেছে।' কোন কোন যোগী বলেন,—মানব-শরীরে ত্রিলোকের অবস্থান এইরূপ: মস্তক হইতে হৃদয় (?) পর্যন্ত স্থান স্বর্গলোক; নাভি হইতে হৃদয় পর্যন্ত 'মর্ত্যলোক' এবং নাভির নিম্ন দেশ হইতে শরীরের অব-শিষ্টাংশে 'পাতাল' অবস্থিত (জ্ঞান ভাষ্য)।

চারি আঙ্গুল ফরজা[১০] তার নাই লেখাজোখা[১১]
তাহে আছে শরীরে ভাল স্থান।
চারি আঙ্গুল মুখ জাতে হয় মহাসুখ
অষ্ট আঙ্গুল জিহ্বার উত্থান॥
তিন আঙ্গুল নাসিকা জাহে প্রাণ বিসিক্ষা[১২]
চারি আঙ্গুল নিরিল জে কান।
একইস হাত অন্ত[১৩] বত্রিশ গোটা দন্ত
দুই হাথ[১৪] দুই পা নির্মাণ॥

---

৩. তরএ— চলাচল করে; পারাপার হয় বা যায়।
সং.√তৃ(উত্তরণ করা)—তরতি>তরই>তরে=পার হয়।

৪. রক্তঘোড়া—রক্তরূপ ঘোড়া।

৫. বাউ— মূলে ছিল বাউ=বায়ু—প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, যথা,—'প্রাণ,' 'অপান,' 'সমান,' 'উদান,' 'ব্যান'। সং.বায়ু>প্রা. বাউ।

৬. লপন—সং.√লপ্ (বলা)+অনট্+ভা=লপন=বলার ক্ষমতা।

৭. মাজা—সং. মজ্জা>মাজা (তুল. অস্থিমজ্জা); অস্থি মধ্যস্থ স্নেহ পদার্থ।

৮. সুসাজা— সুসজ্জিত করা।

৯. লড়া চড়া—নড়া চড়া ('ন'='ল' বাংলায় প্রায়ই 'ন' স্থানে 'ল' এবং 'ল' স্থানে 'ন', যথা 'লেবু'='নেবু'; 'লোনা'='নোনা' উচ্চারিত ও লিখিত হয়)।

১০. ফর্‌জা—শব্দটি আরবী। ইহার অর্থ 'যোনি'।

১১. লেখা জোখা—লেখা+জোখা এই দুই শব্দ মিলিয়া এক শব্দ গঠিত হইয়াছে। এইগুলি বাংলা শব্দ। বাং.√লিখ্ (সং.√লিখ্)+আ=লিখা >লেখা (স্বরসঙ্গতিতে) এবং বাং. √জুখ্+আ=জুখা> জোখা (স্বরসঙ্গতিতে)। লেখা জোখা—হিসাব-নিকাশ, পরিমাণ।

১২. জাহে প্রাণ বিসিক্ষা—'বিসিক্ষা' শব্দের অর্থ অজ্ঞাত। শব্দটির পাঠ ঠিক আছে বলিয়া মনে হয় না। একাধিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া না গেলে শব্দটির সঠিক পাঠ উদ্ধার করা কঠিন। তথাপি সম্ভাব্য পাঠ উদ্ধারে সচেষ্ট হইতে বাধা কি? শব্দান্ত্য, শব্দমধ্য ও শব্দাদ্য 'ক্ষ' আগে যেমন এখনও তেমন, যথাক্রমে 'কৃখ' ও 'খ' রূপে উচ্চারিত হইত ও হইয়া থাকে। এই হিসাবে 'বিসিক্ষা' 'বিসিকৃখা'='বিশি-কৃখা (স=শ)=বিশিখ (সং.)—বিগতা শিখা যাহার (বহুব্রীহি সমাস) অর্থাৎ জ্বালা রহিত। ইহাও অর্থহীন। মনে হয় চরণটির পাঠ এই রূপ ছিল,—"জাহে প্রাণ-বাউ শিখা" (পুনর্গঠিত রূপ)। তাহা হইলে, ইহার অর্থ হয়, 'যাহার মধ্য দিয়া প্রাণবায়ু (অর্থাৎ

কুড়ি আঙ্গুল সাজে শরীরের হাথে পাএ
তাহে শোভা করিছে ভালি[১৫]।
কুড়ি আঙ্গুল ফেফড়া[১৬] দেএ জলকে সাড়া[১৭]
আউট কোটি[১৮] আছে রোমাবলি॥
ন আঙ্গুল পিতখান[১৯] ক্রোধের জে নিজ স্থান
জাহা হৈতে ক্রোধ জ্বলি উঠে।
জখন পিত বাড়এ[২০] তখন ক্রোধ উথলএ[২১]
ঘাঁটাইলে সেহি পিত ঘাঁটে[২২]॥

শ্বাস-প্রশ্বাস) চলাচল করে। প্রাণবায়ুকে 'শিখা' বলার তাৎপর্য এই হইতে পারে যে, নাক দিয়া যে বায়ু বাহির হয়, তাহা অগ্নি শিখার মত গরম বা উষ্ণ।

১৩. অন্ত— ইহা 'অন্ত' নহে; পাঠ হইবে 'অন্ত্র'—নাড়িভুঁড়ি।

১৪. হাথ— সং. হস্ত>হথ=হত্থ>হাথ>হাত (আধু. বানান)।

১৫. ভালি— 'ভাল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'ভালি'-র ব্যবহার লক্ষণীয়। যেহেতু 'শোভা' স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, সেহেতু ইহার বিশেষণ 'ভাল' শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গের রূপ 'ভালি' অন্বয় রক্ষার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'নহলী যৌবনী বালি'-এর মত ব্যবহার মধ্যযুগের মধ্যবর্তী কালে লুপ্ত হইয়া আসিলেও, সম্পূর্ণ যে লুপ্ত হয় নাই, তাহার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই, বিশেষণের সহিত বিশেষ্যের লিঙ্গান্বয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও দেখা যাইতেছে।

১৬. ফেফড়া =ফেঁপড়া (প্রচলিত বাংলায় ব্যবহৃত সাধারণ বানান) —ইহার অর্থ 'ফুস্‌ফুস্-যন্ত্র'; তুলনীয় হিন্দী 'ফেফ্‌ড়া' (ফুস্‌ফুস্)।

১৭. দেএ জলকে সাড়া—ইহা পাণ্ডুলিপিতে ছিল "দেই জেলকে গাড়া"। এই পাঠ অর্থহীন; অর্থযুক্ত পাঠ যে "দেএ জলকে সাড়া" হইবে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। অনুমিত এই পাঠের অর্থ হইবে,— জলের জন্য (জলকে 'নিমিত্তার্থে চতুর্থী' বা 'কে' বিভক্তি) সাড়া দেয়। ফুসফুস জলের জন্য সাড়া দেয়। -'কৃত' (যেমন 'উদ্যানকৃত আসনম্)>-কঅ>ক+এ=কে।

১৮. আউট কোটি—অর্ধচতুর্থ কোটি অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটি।

১৯. পিতখান— পিত্তকোষটি যাহা মাপে নয় আঙ্গুল। (সং. পিত্ত>প্রা. পীত্ত> বাং. পিত।

২০. বাড়এ— সং. বর্ধতে>বড্ঢএ>বাঢ়এ>বাড়এ>(আধু.) বাড়ে।

২১. উথলএ—স্ফীত হইয়া উঠে। সং. উথলতি>উথলই>উথলএ>(আধু.)উথলে।

২২. ঘাঁটে—আলোড়িত হয়। সং. ঘট্ট>প্রা. ঘণ্ট>ঘাঁট+এ=ঘাঁটে।

বারহ[২৩] আঙ্গুল হিআ[২৪] দুই গোটা[২৫]স্তন্য দিআ
তাহে বুক[২৬] করিল নির্মাণ।
নানা স্থানে বৈসে[২৭] লাড়ী[২৮] শরীরে লাড়িচাড়ি
চলে বুলে[২৯] প্রতি স্থানে স্থান ॥
তিন শত ষাটি গাঁঠি[৩০] বাহাওর দিল গুটি[৩১]
স্থানে স্থানে রাখিল শরীরে।
নবদ্বারী বাহাওর কোঠা তাহে দৃঢ় শরীর গোটা
ইহা বিনু নাস্তিক বিস্তরে ॥*

---

২৩. বারহ— বার। সং. দ্বাদশ > বাড়শ > বারহ > (আধু.) বার।

২৪. হিআ—হৃদয় (Heart)। সং. হৃদয় > হিঅঅ > হিআ > হিয়া।

২৫. গোটা— পূর্ণ বা আস্ত অর্থে। শব্দটির মূল অজ্ঞাত। আমার ধারণা—শব্দটি সংস্কৃত 'গুটিকা'=একটি বর্তুলাকার বস্তু। সং. গুটিকা > গুটিআ > গুটি (আদরে) (অনাদরে গোটা)। তুলনীয়—'আমের গুটি'।

২৬. বুক— ইহা সংস্কৃত 'বক্ষ:' শব্দ হইতে উৎপন্ন নহে। সম্ভবত: ইহা আর্যদের মুখের ভাষায় (যাহাকে ডঃ শহীদুল্লাহ 'আদিম প্রাকৃত' বলিয়াছেন) ছিল 'বুক্স'। তাহা হইতে পাণিনি সংস্কৃত রূপে গ্রহণ করেন 'বক্ষস্'=বক্ষ:। (আদিম প্রা.) 'বুক্স' > প্রা. বুক্ক > বাং. বুক।

২৭. বৈসে— সং. উপবিশতি > উবইসই > বইসই > বৈসে > বসে।

২৮. লাড়ী— নাড়ী=নাড়ি (ল=ন, যেমন—লেবু=নেবু)

২৯. চলে বুলে—চঞ্চলভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। সং.√চল্ + তি=চলতি; চলতি > চলই চলে; সং.√বল্=প্রা.√বোল্ল=বাং.√বুল্+এ।

৩০. তিন শত ষাট গাঁঠি—মানব-শরীরে মোট ৩৬০-টি গাঁট বা গ্রন্থি আছে। গাঁঠি—সং. গ্রন্থী > গন্থি > গাঁঠি > গাঁইট্ > গাঁট॥ এখানে 'গাঁটের' অর্থ কি বুঝা গেল না; কারণ—(১) অঙ্গস্থিত সন্ধি স্থানকে 'গাঁট' বলে (২) এবং ইংরেজীতে যাহাকে Gland 'গ্লাণ্ড' বলে তাহাকেও 'গাঁট' বা 'গ্রন্থী' বলে; এই Gland গুলি মানুষের শরীরে অবস্থিত রসনিঃসারক কোষ মাত্র।

৩১. বাহাওর দিল গুটি—উপরে 'গোটা' দ্রষ্টব্য। এই বাহাত্তরগুটিও কি Gland -এর সংখ্যা?

* নবদ্বারী - - - - বিস্তরে—মানব-শরীর একটি নবদ্বার বিশিষ্ট ও বাহাত্তর প্রকোষ্ঠসমন্বিত গৃহ মাত্র; এই গূঢ়সম্বন্ধে ইহার অধিক বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া যায় না।

*তিন শত হাথ মাড়ি শরীরে জাএ লাড়িচাড়ি
ছোট বড় তিলের প্রমাণ।
শরীরে কৈল বেকত[৩২] বন্ধন জে তিন শত
ইহা হৈতে চলএ সমান॥*
করিল নয় আঙ্গুল[৩৩] বজ্রকুটির[৩৪] সমতুল
বার আঙ্গুল আম্রের কুটি[৩৫]।
ইঙ্গিলা[৩৬] পিঙ্গিলা[৩৭] তায় কন্দর্প[৩৮] আইসে[৩৯] জাএ
নিরবধি বহে উজান[৪০] ভাটি॥[৪১]

** তিন শত - - - - চলএ সমান—মানব-শরীরস্থ নাড়ী-ভুঁড়ির দৈর্ঘ্য তিন শত হাত; অথবা মানব-শরীরে যত নাড়ি অর্থাৎ শিরা-উপশিরা আছে, তাহার সকলগুলির দৈর্ঘ্য তিন শত হাত।

৩২. বেকত—'ব্যক্ত' স্বরভক্তিতে 'বেকত'।

৩৩. আঙ্গুল— প্রাচীন কালের প্রাথমিক পরিমাপক (Primary unit of measurement)। 'আঙ্গুল' শব্দ এখানে সাংকেতিক অর্থে ব্যবহৃত, যথা—'নয় আঙ্গুল'=নবদ্বার; 'বার আঙ্গুল'=বার মাস বা বার রাশি বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত।

৩৪. বজ্রকুটির— বজ্রের তুল্য দুর্ভেদ্য কুটির (কুটীর)।

৩৫. আম্রের কুটি—আম কুটির অর্থাৎ কাঁচা ঘর (তুল. আম মাংস=কাঁচা মাংস)।

এইখানে সাধক যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ এইরূপ: 'নবদ্বার-সম্বিত দুর্ভেদ্য বজ্রকুটিরই তাঁহার দেহ। কিন্তু, বার রাশি বা বার মাসের সহিত সংশ্লিষ্ট আরও একটি আম-কুটির অর্থাৎ কাঁচাঘর বজ্রকুটিরের সঙ্গে সংযুক্ত আছে।' ইহা কি বলিতে পারিলাম না।

৩৬/৩৭. ইঙ্গিলা-পিঙ্গিলা—'ইঙ্গিলা' নামে কোন নাড়ী নাই। ইহার যোগশাস্ত্রীয় নাম 'ইঙ্গলা' বা 'ইড়া'। 'পিঙ্গিলা'=পিঙ্গলা। যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থে দেখা যায়—মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে বাম ও ডান পার্শ্বে 'ইড়া' ও 'পিঙ্গলা' নামে দুইটি নাড়ী সন্নিবিষ্ট আছে এবং এতদুভয়ের মধ্যে 'সুষুম্না'-র স্থান। সাধকের পক্ষে 'ইড়া'-নাড়ী গঙ্গা ও 'পিঙ্গলা'-নাড়ী যমুনা স্বরূপ এবং 'সুষুম্না'-নাড়ী সরস্বতী স্বরূপ। এই তিনের মিলনের নাম 'ত্রিবেণী-সঙ্গম'। অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত লোকের মুখে ও লেখায় 'ইঙ্গলা'-নাড়ী 'ইঙ্গিলা'-রূপে, 'পিঙ্গলা'-নাড়ী 'পিঙ্গিলা'-রূপে এবং 'ত্রিবেণী-সঙ্গম' অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন স্থানকে 'তিরপিনীর ঘাট' রূপে উচ্চারিত ও লিখিত হইতে দেখা যায়। যোগীরা এই 'ত্রিবেণী-সঙ্গমে' স্নান করিয়া সর্বপাপ হইতে মুক্তি লাভে সচেষ্ট হইয়া থাকেন।

এহিত শরীর মাঝে পর্বত শিখর রাজে[৪২]
তাহে আছে ঝোর[৪৩] ঝঙ্কারে[৪৪]।
নিভৃত আছে স্থান বন আছে খানে খান[৪৫]
কত জীব জন্তু তাহে চরে॥
এহিত শরীর মাঝে নর-দেব-লোক[৪৬] আছে
আর কত অশেষ বিশেষ[৪৭]।
কত আছে রক্ষক ধূর্ত আর সেবক
ঘটে আছে ব্রহ্মাণ্ড মহেশ॥[৪৮]

বলাবাহুল্য এই নাড়ীত্রয়কে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির গুণ বিশিষ্ট বলিয়া মনে করা হয়। 'সুষুম্না' ব্রহ্ম নাড়ী;—ইহাতে নাকি জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত।

৩৮. কন্দর্প— কামদেব অর্থাৎ যৌন-সম্ভোগ-স্পৃহা।

৩৯. আইসে—আসে। সং. আবিশতি>আইসই>আইসে>আসে।

৪০. উজান—অনুমিত সং. উদ্যাপন>উজ্জাঅন>উজাঅন>উজান।

৪১. ভাটি—ভাটা, ভাঁটা, ভাটি, ভাঁটি। শব্দটি 'অজ্ঞাত-মূল'।

৪২. এহিত- - - রাজে—আমাদের এই শরীরে 'সুমেরু' ও 'কুমেরু' নামক পর্বতদ্বয় তাহাদের শিখরসহ বর্তমান আছে বলিয়া সাধকেরা কল্পনা করিয়া থাকেন।

৪৩. ঝোর—পয়:প্রণালী বা নয়ান জুলি। পর্বত হইতে নির্গত অর্থাৎ ক্ষরিত স্বল্পতোয় ঝর্ণাধারা। তুল. 'পাগলা-ঝোরা'। চট্টগ্রামে 'ঝোরা' শব্দের ব্যবহার আছে; ইহার অর্থ জল নিকাশের সরু ব্যবস্থা। সং. ক্ষরা> ঝোরা। (ক্ষ=ঝ) যেমন ক্ষুপ>ঝোপ।

৪৪. ঝঙ্কারে—মধুর শব্দে।

৪৫. খানে খানে—খান-খান=খণ্ড-খণ্ড।

৪৬. নরদেব লোক—নরলোক ও দেবলোক।

৪৭. অশেষ বিশেষ—রকমারি বিশিষ্ট বস্তু আছে।

৪৮. ঘটে আছে ব্রহ্মাণ্ড মহেশ—ইহা পুনর্গঠিত পাঠ। মূল পাঠ 'ঘটে আছে ব্রহ্ম ও হেশ'।—মানব শরীরে 'ব্রহ্মা' বা সৃষ্টিকর্তা এবং 'মহেশ' (মহেশ্বর) অর্থাৎ ধ্বংসকর্তা বাস করেন বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে।

এহিত শরীর মাঝে　চারি রগ[৪৯] রহি আছে
　　সংসারে[৫০] সদা রাখে বান্ধা।
সত্য ত্রেতা দ্বা[পর]　কলি মহা প্রখর
　　ইহাতে জানিএ[৫১] ভাল[৫২] মন্দা[৫৩]॥*

এহিত শরীর মাঝে　চারি বেদ[৫৪] ভালে[৫৫] রাজে
　　জাহাতে সক[লে জ্ঞান] চএ[৫৬]।
রগে বৈসে ঋগ্বেদ　সাম [যজু] অথর্ব ভেদ[৫৭]
　　ইহাতে সকল [..] সঞ্চএ॥

---

৪৯. রগ—শব্দটি ফার্‌সী رگ ='রগ'। ইহার অর্থ 'শিরা'। প্রচলিত ফকিরী গ্রন্থে দেখা যায় (১) 'আবী'-রগ, (২) 'বাদী'-রগ, (৩) 'খাকী'-রগ, (৪) 'আতশী'-রগ। যথা—

"হুলকুমের রগ 'আবি' বলিনু তোমারে।
'বাদি' রগ নাভুতের জানিবে অন্তরে॥
ভুরির রগ 'খাকি' হৈল 'আতশী' শিরের।"
(ফকীর বিলাস)

৫০. সংসারে— দেহকে। যেহেতু 'যাহা নাই ভাণ্ডে (দেহে) তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে,' সেহেতু সংসার=ব্রহ্মাণ্ড=দেহ।

৫১. জানিএ—জানিয়া+লএ=জানিএ।

৫২. ভাল সং. ভদ্রক>প্রা. ভল্লঅ>ভালঅ>ভাল।

৫৩. মন্দা— 'মন্দ' (=খারাপ) শব্দের স্ত্রী. লিং. 'মন্দা'। এখানে স্ত্রীলিঙ্গের রূপ ব্যবহৃত হয় নাই। ছন্দের খাতিরে 'বান্ধা' শব্দের অন্ত্যানুপ্রাস রূপে ('অ'='আ') 'মন্দা'।

* সত্য - - - -মন্দা—মানব দেহে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের সমাবেশ আছে। ইহার দ্বারা মানুষ ভাল-মন্দ জানিয়া লইতে সমর্থ হয়।

৫৪. চারি বেদ— ঋগ্বেদ, সাম, যজুঃ, অথর্ব। এইগুলির 'ভেদ' বা পার্থক্য পরের চরণে দ্রষ্টব্য।

৫৫. ভালে— এখানে '-এ'-কার ক্রিয়া-বিশেষণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন এখনও 'ধীরে চল', 'আস্তে বল', 'ভালোয়-ভালোয় চলে গেল' ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করি।

৫৬. চএ—আহরণ করে, চয়ন করে। সং.√চি—চয়তি>চঅই>চএ।

এহিত শরীর মাঝে চারি কিতাব[৫৮] [বিরা] জে
নিয়মেতে সব জাতি চলে।
ভব রুদ্র[৫৯] আছে দেহে সাত [টি] সমুদ্র[৬০] তাহে
নিরবধি চলে তারা জলে ॥

---

৫৭. ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব—এই চারি বেদের 'ভেদ' বা বিষয়-বস্তু সম্বন্ধীয় প্রভেদ সংক্ষেপে এইরূপ :

(ক) ঋক্ + বেদ = ঋগ্বেদ—√ঋচ্ (স্তুতি করা) + ক্বিপ্ (ণ) = ঋক্—'গায়ত্রী' প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীতের দ্বারা দেবতাদের স্তুতি করা যায়,—এমন গানের সমষ্টির নাম 'ঋগ্বেদ'। ইহা চারি বেদের মধ্যে প্রথম বেদ।

(খ) সাম (=সামন্)—√সো (নাশ করা) + মন্ (ক) = সামন্ > সাম—ইহা চারি বেদের মধ্যে তৃতীয় বেদ। ইহাতে গেয় মন্ত্রাদি বিধৃত আছে।

(গ) যজুঃ (যজুস্) = যজুঃ + বেদ—যজুর্বেদ—√যজ্ (পূজা করা) + উস্ (ণ) যজু—নানাবিধ যজ্ঞের বিধি-বিধান সম্বলিত গদ্যে রচিত বেদ। ইহা চারি বেদের মধ্যে দ্বিতীয় বেদ।

(ঘ) অথর্ব (অথর্বন্)—অথ (=মঙ্গল) + √ঋ (গমন করা) + বনিপ্ (ক) = অথর্ব—ইহা চতুর্থ বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও ইহাকে অনেকে বেদ বলিয়া স্বীকার করেন না। Wilson সাহেব তন্মধ্যে একজন।

৫৮. কিতাব— চারি কিতাব। ইহারা মানব শরীরে বিরাজিত, যথা—

(ক) তৌরাত (The Torah)—ঋগ্বেদ
(খ) ইঞ্জীল (The New Testament)—যজুঃ
(গ) জবুর (The Psalms)—সাম
(ঘ) ফুরকান (The Quran)—অথর্ব।

৫৯. ভব রুদ্র আছে দেহে—মানুষের দেহের অভ্যন্তরে শিব তাঁহার মঙ্গলময়ী ও বিনাশিনী মূর্তিতে বিরাজিত। 'ভব' শব্দের এক অর্থ 'মঙ্গল,' এবং মঙ্গলময় শিবকেই 'ভব' বলা হয়। 'রুদ্র' শব্দের এক অর্থ 'প্রলয়ঙ্কর, এবং প্রলয়ঙ্কর শিবকেই রুদ্র বলা হয়। আল্লার এক নাম যেমন 'রহীম্' বা করুণা নিদান, তেমন আর এক নাম 'কাহ্হার্' বা (ক্রুদ্ধ) শাস্তিদাতা। 'ভব-রুদ্র' ব্যবহারে 'রহীম্' ও 'কাহ্হার্' ইসলামী শব্দদ্বয়ের ধারণা তুলনীয়।

৬০. সাতটি সমুদ্র তাহে—মানব-দেহে সপ্ত-সমুদ্র অবস্থিত বলিয়া সাধকদের ধারণা। এই সপ্ত-সমুদ্র সম্বন্ধে 'শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর' উক্তি স্মরণীয় :

"লবণোদস্তথা মূত্রে, শুক্রে ক্ষীরোদ-সাগরঃ।
মজ্জা দধি-সমুদ্রশ্চ তদূর্ধ্বং ঘৃত-সাগরঃ ॥
বসাপঃ সাগরঃ প্রোক্ত ইক্ষুঃস্যাৎ কটিশোণিতম্।
শোণিতেষু সুরাসিন্ধু কথিতা সপ্ত সাগর ॥"

শেখ জাহেদ কএ[৬১]　জানিলুঁ[৬২] জে নিশ্চএ
ঘট কৈল[৬৩] গোসাঞি ভাণ্ডার।[৬৪]
সংসারেত জথা[৬৫] দেখোঁ[৬৬]　সব জে উহাতে লখোঁ[৬৭]
ঘট হৈতে সকল প্রচার॥

মানব-দেহে যে সপ্ত সমুদ্র আছে, তাহা এইরূপ: মূত্রে লবণ-সমুদ্র, শুক্রে ক্ষীরসমুদ্র, মজ্জায় দধিসমুদ্র, চর্মে ঘৃত-সমুদ্র, মেদে (বসাপ) জল-সমুদ্র, কটি-রক্তে ইক্ষু-সমুদ্র এবং শোণিতে সুরা-সমুদ্র।

৬১. কএ—কহে। সং. কথয়তি>কহঅই>কহই>কহে>কএ।

৬২. জানিলুঁ— মুঞি জানিলুঁ=আমি (মুই) জানিলাম (জানিল)।

৬৩. কৈল— করিল। ইহা নূতনভাবে গঠিত, যথা—'কৃত+ইল'।

৬৪. ঘট কৈল----ভাণ্ডার—গোস্বামী (গোসাঞি=ভগবান) ঘটকে (মানবদেহকে) একটি ভাণ্ডার অর্থাৎ সব কিছুর আধাররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধারণা হইতে বাউল ফকীরেরা বলিয়া থাকেন,—'যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।' এই প্রসঙ্গে 'শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী'-র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিও স্মরণ করা যায়:

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃসন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।
পাতালং ভূধরালোকা আদিত্যাদি নবগ্রহাঃ॥
ভূরাদি সপ্তস্বর্গাশ্চ নাগাশ্চ সর্বদেহিনাম্।
পিণ্ডমধ্যে স্থিতাঃ সর্বে স্থানং বদামিতে॥"

অর্থাৎ

ব্রহ্মাণ্ডে যে-সমস্ত বস্তু বর্তমান, সে-সমস্ত বস্তু মানব-দেহেও বিদ্যমান। পাতাল, ভূধর, লোক, আদিত্য প্রভৃতি নবগ্রহ, ভূরাদি সপ্তস্বর্গ ও নাগগণ,—সমস্তই প্রাণীর দেহমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের স্থান তোমাকে বলিতেছি।

৬৫. জথা, (অন্যত্র) জত—সং. যৎ+ত=যত্ত>জত, জথ।

৬৬. দেখোঁ—মুঞি দেখোঁ=মুই দেখম (দ্রক্ষ্যামি)।

৬৭. লখোঁ—মুঞি লখোঁ=মুই লখম (লক্ষ্যামি)।

অষ্টম অধ্যায়

আউটি বিচার

॥ ক্ষিপ্র ছন্দ ॥

শ্রী রাগ

গর্ভের বিচার জবে হৈল সমাধান।
আউটি[১] বিচার কিছু শুনহ সাবধান[২] ॥
জল স্থান কোথাএ আনল কোথা বৈসে[৩]।
মৃত্তিকা সঞ্চরে[৪] কোথা বাউ[৫] কোথা পৈসে[৬] ॥
কহিব[৭] সকল কথা ইহার বিধান।
মৃত্তিকা আনল বরুণ বাউ স্থান ॥

[ইহা এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়। ইহার সংখ্যা অষ্টম। এই অধ্যায়ে 'আউটি বিচার' বা শারীর-রহস্য সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। **সম্পাদক**]

১. আউটি—অর্ধচতুর্থ=সাড়ে তিন। প্রত্যেকের হাতে প্রত্যেকের দেহের মাপ সাড়ে তিন হাত। তাই 'সাড়ে তিন' মরমীয়াদের কাছে 'দেহ' বুঝাইবার জন্য পারিভাষিক শব্দ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্যুৎপত্তি পূর্বে দ্রষ্টব্য।

২. সাবধান—মনোযোগ সহকারে। বিস্তৃত আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৩. বৈসে—সং. উপবিশতি>উবইসই>বইসই>বইসে>বৈসে>বসে।

৪. সঞ্চরে—ব্যুৎপত্তি: সং. সম্+√চর্ (গমন করা)+অল্ (ভা.)=সঞ্চর+এ (নাম ধাতুতে)=সঞ্চরে—চলাচল করে।

৫. বাউ—বাতাস। সং. বায়ু>প্রা. বাউ>বাং. বায়ু (সংস্কৃতের প্রভাবে)।

৬. পৈসে—প্রবেশ করে। সং. প্রবিশতি>পইসই>পইসে>পৈসে।

৭. কহিব— ভবিষ্যৎ কালের রূপ। সং.√কথ্=বাং.√কহ+ইব।

॥ ফ ফ ড ॥　এহি তিন অক্ষরে বসএ বরুণ।
॥ ক ল জ ॥　এহি তিন অক্ষরে বসএ আগুন ॥
॥ ত ন ॥　মৃত্তিকার স্থান দুই অক্ষরে স্থাপিত।
॥ দ ল ॥　এহি দুই অক্ষরে বাউ শরীরে ব্যাপিত ॥　৮

৮. 'ফ ফ ড'; 'ক ল জ'; 'ত ন'; 'দল' প্রভৃতি যৌগিক 'হীং' 'ক্লিং' শ্রেণীর ঐন্দ্রজালিক ধ্বনির, অথবা কুর্‌আন্ শরীফের 'আলিফ্ লাম্-মীম্' (الم), 'য়া-সীন্' (يس) প্রভৃতি দুর্জ্ঞেয় ধ্বনির অনুকরণে উদ্ভাবিত দুর্বোধ্য সাঙ্কেতিক ধ্বনির দৃশ্য-রূপ। লক্ষণীয় বিষয় এই,—ধ্বনিগুলি ব্যঞ্জন-ধ্বনি হইলেও, হসন্তান্ত নহে। ইহাদের সহিত আদি-স্বর 'অ' ইহার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। 'অ'—ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি বাদ দিয়া শুধু ব্যঞ্জন-ধ্বনি ব্যবহারে ধ্বনিগুচ্ছগুলির সাহায্যে কোন্ শব্দ বুঝানো হইয়াছে, তাহা চট্ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে না পারায়, এক একটি হেঁয়ালির সৃষ্টি হইয়াছে। শব্দগুচ্ছের পরে হেঁয়ালিটিও বুঝিয়া লইবার প্রতি কথায় ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য। এখন এই ধ্বনিগুচ্ছের দ্বারা কি কি বুঝানো হইয়াছে সে-বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া যাউক:

ফ ফ ড—বরুণ বা জলের স্থান। তাহা হইলে মানব শরীরে ইহা কি? ইহা হইল 'ফেফড়া'; ইহার অর্থ 'ফুসফুস'। 'ফেফড়া' শব্দটি হিন্দী। আঞ্চলিক বাংলায় 'ফুস্‌ফুস্' অর্থে 'ফেফড়া' শব্দের ব্যবহার আছে। লোকের বিশ্বাস,—'ফেফড়া' সিক্ত রাখিবার জন্যই মানুষ জলপান করে এবং 'ফেফড়া' শুষ্ক হইতে থাকিলেই মানুষের তৃষ্ণা পায়। এই কারণেই 'ফেফড়া' বা 'ফুস্‌ফুস্‌কে' বরুণের অর্থাৎ জলের স্থান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

ক ল জ— অগ্নির স্থান। তাহা হইলে মানব-শরীরে আগুনের স্থান কি? ইহা 'কলিজা' ব্যতীত আর কিছুই নহে। ডঃ এস্. কে. চাটুর্জের মতে সংস্কৃত (প্রা. ভা. আ.) 'কালেয'>প্রা. কালেজ> হি. কলেজা, কলিজা, কলিজী (উর্দু) রূপ ধারণ করিয়াছে। পরে হিন্দী 'কলিজা' বাংলায় গৃহীত হইয়া থাকিবে। এই 'কলিজাই' অগ্নির স্থান। আঞ্চলিক বাংলায় এখনও 'পরান পোড়ে'='কইল্‌জা পোড়ে'—এই উভয় বাক্‌রীতি প্রচলিত আছে। এই জন্যই 'কলিজা' বা হৃৎপিণ্ডকে অগ্নির স্থান বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বিরহের জ্বালা, প্রেমের জ্বালা, স্নেহের জ্বালা, শত্রুতার জ্বালা—সর্ববিধ জ্বালাই হৃদয়ে রহিয়াছে বলিয়া মানুষের ধারণা। সুতরাং 'কলিজা'='হৃদয়' অগ্নির স্থান বলিয়া পরিকল্পিত।

ত ন— মৃত্তিকার স্থান। মানব-শরীর মৃত্তিকায় সৃষ্ট,—ইহা সর্বস্বীকৃত সত্য। তাহা হইলে, 'ত ন' এই দুই অক্ষরে 'তনু' বা শরীর (মৃত্তিকায় তৈয়ারি) বুঝাইতেছে। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত 'তনু'=ফার্‌সী 'তন্' (تن)।

আদ্যের ভেদ[৯] কিছু কহোঁ[১০] স্থানে স্থানে।
চারি বস্তুর[১১] ভেদ কহোঁ লেহু[১২] পরমানে[১৩] ॥
শরীরের মাঝে রহে জলের রঙ্গ কি।
আনল জানিবে কোন রঙ্গের ভিতর দি[১৪] ॥
কোন রঙ্গের ভিতর বাউ গিআ[১৫] বৈসে।
মৃত্তিকার রঙ্গ[১৬] জে কোন রঙ্গে আইসে[১৭] ॥
চারি রঙ্গের ভেদ কহিতে প্রকার।
একে একে কহোঁ সব করিআ বিচার ॥

দ ল— সর্ব শরীর ব্যাপ্তি বায়ুর বিচরণ ক্ষেত্র। তাহা হইলে দ ল' 'দিল' বুঝাইতেছে। 'দিল্' (دل) শব্দটি ফার্‌সী; ইহার অর্থ 'প্রাণ', 'মন'। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—দেহস্থ এই পঞ্চ-বায়ুর নাম 'প্রাণ'='দিল'। এই জন্যই শরীরের কোন নির্দিষ্ট একটি স্থানে 'দিল' বা 'প্রাণ' স্থায়ী নহে। ইহা শরীরের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। বায়ুর মত চঞ্চলতাই ইহার বৈশিষ্ট্য। তুল. দিল্ বেকরার= دل بیقرار=মন বা প্রাণ অস্থির; মন উচাটন। সুতরাং 'দিল'-কে বায়ুর স্থান বলা হইয়াছে।

৯. ভেদ— গোপন-তত্ত্ব, রহস্য (বাংলা অর্থ)। সংস্কৃত অর্থে—√ভিদ্ (ভেদ করা, ছেদন করা)+ঘঞ্ (ভা.)=ভেদ—ছেদন, বিদারণ প্রভৃতি।

১০. কহোঁ— মুই কহি। তুল. আঞ্চলিক 'মুই কহন' (এক বচন) 'আমি কহি' (বহুবচন)

১১. চারি বস্তু—ক্ষিত্যপতেজোমরুৎ (লক্ষণীয় 'ব্যোম' অনুপস্থিত)। সূফীরা চারিটি, {যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ (অগ্নি) ও মরুৎ} মূল উপাদানে মানব সৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করেন এবং হিন্দুশাস্ত্র মতে মানব সৃষ্টির উপাদান পাঁচ।

১২. লেহু—লও (মধ্যম পুরুষের রূপ)। ধাতু (বাং.)√ল<√লভ্ (সং.) এই শব্দটি চর্যাপদে দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—

১. 'সুনুপাখ ভিড়ি লেহুরে পাস।' (চ.১)
(শূন্যতা-পাখা পাশে চাপিয়া লও)

২. 'উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক।' (চ.৩২)
(ঋজু রে ঋজু (পথ) ছাড়িয়া বাঁকা (পথ) লইও না)

১৩. পরমানে—প্রমাণে অর্থাৎ প্রমাণ করিয়া।

১৪. দি— দিয়া (বাংলা 'অনুসর্গ' রূপে ব্যবহৃত শব্দ)।

১৫. গিআ— প্রা. ভা. গত+ইআ>গঅ+ইআ=গইআ>গিয়া।

|| স ত ||　　এই দুই অক্ষরের ভিতর জলের রঙ্গ।
|| ক ল ||　　আনলের রঙ্গ এই দুই অক্ষর সঙ্গ ॥　}১৮
|| স ব জ ||　　বাউর রঙ্গ এই তিন অক্ষর ভিতরে।
|| জ র দ ||　　মিত্তিকার রঙ্গ রহে এই তিন অক্ষরে ॥
এহি সে রঙ্গের ভেদ করিলুঁ বিচার।
চারি রঙ্গ হৈতে হএ পৃথিবী প্রচার ॥১৯

---

১৬. রঙ্গ— শব্দটি কৌতুকাবহ (interesting)। শব্দটি 'বর্ণ' ও 'রঙ্' অর্থে সংস্কৃত ও ফার্সীতে ব্যবহৃত হয়।
সং.√রন্‌জ্ (রং করা)+ঘঞ্ (ণে)=রঞ্জক দ্রব্য, বর্ণ, রঙ।
ফা. রন্‌গ্ (رنگ)=রং। ফার্সী শব্দটি মূল ইরানী আর্য হইতে উদ্ভূত।

১৭. আইসে— সং. আবিশতি>আইসই>আইসে>আসে।

১৮. এই চারি চরণের অর্থাৎ দুই শ্লোকের গোড়ায় যেই সঙ্কেত-চিহ্ন অক্ষরে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার মূল তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের জন্য পূর্বে বিবৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১. স ত—এই দুই অক্ষরের দ্বারা জলের রঙ্ প্রকাশ করা হইয়াছে। তবে, তাহা কি? অক্ষর দুইটির সহিত অর্থজ্ঞাপক স্বরধ্বনি যোগ করিলে, যে শব্দ গঠিত হয় তাহা হইল 'সিতি'। ইহার অর্থ শ্বেতবর্ণ। সং.√সি+ক্তি (র্তৃ)=সিতি—শুভ্রবর্ণ বা 'সাদা'রং। এই রঙ্ জলের বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অন্যত্র দেখা যায় জলের রং 'লাল'; যথা—

"পীর বলে পানির যে লাল রঙ্গ হয়।
খাকের জরদ রঙ্গ বলি যে তোমায় ॥
হাওয়ার সবুজ রঙ্গ আতশ হয় সিয়া।
ইহার খোলসা হাল শুন মন দিয়া ॥".
(ফকীর বিলাস, ঢাকা, ১৯৫০)

২. ক ল—এই দুই অক্ষরের দ্বারা অগ্নির রঙ্ প্রকাশ করা হইয়াছে। 'ফকীর-বিলাস' প্রভৃতি 'আদ্য-পরিচয়' পুস্তকের শ্রেণীভুক্ত পরবর্তী বহী। সুতরাং, অগ্নির (আতশের, আনলের) রঙ্ হইল কল বা 'কাল' (সিয়া)। এই বিবেচনায়,—

৩. স ব জ—'সবুজ' হইল বায়ুর (হাওয়ার) রঙ্।

৪. জ র দ— 'জরদ' (زرد -ফা.)=পীত বর্ণ, মৃত্তিকার রঙ্ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মিত্তিকা—প্রাচীন বানান রক্ষিত। সং. মৃত্তিকা>মট্টিআ>মাটি (প্রাকৃতে 'ঋ' স্বর 'অ' 'ই' 'উ' প্রভৃতিতে পরিবর্তিত হয়, শৃগাল>শিয়াল; ঋজু>উজু ইত্যাদি)

সংসারের মাঝে গোসাঞি জথেক[২০] সৃজিল।
এহি চারি রঙ্গ হৈতে সব নির্মাইল॥
এহি চারি রঙ্গ জেবা করে পরিচএ।
এহি রঙ্গ হৈতে আর জথেক রঙ্গ হএ॥
সংসারের মাঝে জথ[২১] আছে তরুবর।
অনুক্রেমে[২২] সকলের আছএ শিকড়॥
বৃক্ষ লুপ্ত হএ তার শিকড় ছেবনে[২৩]।
মনুষ্য শিকড় কোথা কেহ নাঞি জানে।।

বৃক্ষের শিকড় লড়ে কহিল ব্রহ্ম।
মনুস্যের শিকড় বিপরিত কম্ম॥[২৪]

---

১৯. চারি রঙ্গ হৈতে হএ পৃথিবী প্রচার এই—পৃথিবীতে যত প্রকারের রঙ্ আছে, তাহার উৎপত্তি চারি রঙ্ হইতে অর্থাৎ পৃথিবীতে মৌলিক রঙ্ চারিটি যথা—

১. শুভ্র—'অপ্' বা জলের রঙ্।
২. সবুজ—'মরুৎ' বা বায়ুর রঙ্।
৩. জরদ—'পীত' বা হলুদ রঙ্।
৪. কালো—'তেজ' বা অগ্নির রঙ্।

২০. জথেক— যেই সমস্ত। উৎপত্তি সম্ভবতঃ এই রূপ—
সং. যাবৎ (যাবৎ পরিমাণ)>প্রা. জেত্তিঅ>জেথ. জেত, জত +এক=জতেক, (সংস্কৃতের প্রভাবে লেখায়) 'যতেক'= যেই পরিমাণ, যেই সমস্ত।

২১. জথ—যত (=জত)। যাবৎ>জেত্তিঅ>জত, জথ, যত।

২২. অনুক্রেমে—অনুক্রমে ; পারম্পর্য অনুসারে। পশ্চিম বঙ্গের নানা অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া মালদহ, চব্বিশ-পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে 'ক্রমে ক্রমে' মৌখিক উচ্চারণ 'ক্রেমে ক্রেমে' রূপ ধারণ করিয়া থাকে। আবার কখনও কখনও 'কের্মে কের্মে' রূপেও উচ্চারিত হয়।

২৩. ছেবনে— ছেদনে (করণে-এ'-কার)। শব্দটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রাচীন বাংলার (চর্যাপদের) রূপটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে, যথা—

'বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী॥ ধ্রু॥" (চ. ৪৫)
ছেবই=ছেদয়তি (সং.)>প্রা. ছেবই।
ছেবন—ছেব্+অন্=ছেদন, কর্তন।

২৪. মনুষ্যের শিকড় বিপরিত কম্ম—ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, বৃক্ষের শিকড় (নিম্নমুখী বলিয়া) নড়াচড়া করে এবং মানুষের শিকড় ইহার বিপরীত ধর্মী

॥ র ত ॥　　মনুষ্যের শিকড় দুই অক্ষরের সহিত।
ইহা চিনিলে তার তনু হএ স্থিত ॥

পৃথিবীর মধ্যে জেন বৃক্ষের জড়[২৬]।
মনুষ্যের শরীরে অই বির-শিকড়[২৭] ॥
সংসার অপবিত্র পবিত্র করে জল।
জল পবিত্র করে বাউ মহাবল ॥

অর্থাৎ উর্ধ্বমুখী। এই মতটি সংস্কৃত "উর্ধ্বমূলোঽধঃশাখ এষোঽশ্বত্থ সনাতনঃ"(গীতা, কঠোপনিষদ) মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়।

এই মতানুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই একটা উলটাগাছ; ইহার শিকড় আকাশে ও ডালপালা নিম্ন দিকে প্রসারিত। মানব শরীর বা দেহ ব্রহ্মাণ্ড তুল্য বলিয়া ইহাও একটা উলটাগাছ। সুতরাং, ইহার শিকড় উর্ধ্ব দিকে ও ডালপালা নিম্ন দিকে।

২৫. র ত— অনুমিত পাঠ; মূল পাঠ—'ক ত'। মূল পাঠের 'ক ত' দুই অক্ষরে এমন কোন সুসঙ্গত অর্থযুক্ত শব্দ পাওয়া যাইতেছে না, যাহার সহিত মনুষ্যের শিকড়ের কোন সংস্রব দেখানো যায়। এই প্রসঙ্গে এই শ্লোকর পূর্ববর্তী শ্লোকটিও লক্ষ্যযোগ্য—

"বৃক্ষ লুপ্ত হএ তার শিকড় ছেবনে।
মনুষ্য শিকড় কোথা কেহ নাহি জানে।।"

সুতরাং, বুঝিতে হইবে মানুষের শরীরে গোপনভাবে 'মানুষের শিকড়' অবস্থিত। তবে, কেহ তাহার খবর রাখে না। এই কথা পরবর্তী শ্লোকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে ইহা কি? এই পুস্তকের পূর্বাপর উক্তি, তত্ত্ব ও তথ্যের কথা মনে রাখিয়া বলিতে হয়—যেই শব্দের দ্বারা 'মানুষের শিকড়' বুঝাইতে পারে, তাহা 'ক ত' অক্ষরে প্রকাশ করা যায় না। ইহা লিপিকর প্রমাদ। লিপিকর 'র ত' লিখিতে গিয়া 'ক ত' লিখিয়া থাকিবেন। 'র ত' অক্ষরে সঙ্গত অর্থ হয়। ইহা রেত<রেতঃ<রেতস=বীর্য, চন্দ্র, মনী অর্থে গৃহীত। 'রেতঃ' (=রেত) বা শুক্র মানুষের শরীরেই থাকে অথচ শরীরের কোথায় থাকে তাহা কেহ বলিতে পারে না। রেতঃপাত জীবন নাশের হেতু বলিয়াও স্বীকৃত। সুতরাং 'রেতঃই' মানুষের অদৃশ্য শিকড়।

২৬. জড়— শিকড়। সং. জটা>জড়া>জড়।

২৭. বির-শিকড়—বীর শিকড়—প্রধান শিকড়। মাটির মধ্যে যেমন গাছের মূল শিকড় প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করে, মানুষের শরীরেও তেমন তাহার বীর-শিকড় বা প্রধান শিকড় অর্থাৎ বীর্য আত্মগোপন করিয়া থাকে। কোথায় যে থাকে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

অপবিত্র হৈআ জদি থাকে তাহা দেহে।
অপবিত্র পবন পবিত্র করে তাহে॥
সুনহ বাউ বার্তা[২৮] (ভর্ত) করহ শ্রবণ।
॥ শ ন ॥ [২৯] এই দুই অক্ষরে পবিত্র হএ পবন॥
সংসারে ফিরিআ বাউ ঘুরিয়া ভ্রমএ।
বসিবার বেলা করে ইহাতে আশ্রএ॥

শরীরের ভেদ কিছু করহুঁ[৩০] বাখান।
গুরু ভএ[৩১] ন করিলুঁ[৩২] (তার) সমাধান[৩৩]॥
স্বর্গ করিআ গোসাঞি পূজিল[৩৪] স্বর্গস্থান।
সংসারের মাঝে হৈল জাহার বাখান[৩৫]॥
স্বর্গবাসী জথ থাকে স্বর্গে লৈআ জাএ।
জে জেমন করে তার ফল জে ভুঞ্জাএ[৩৬]॥
অতি মনোহর ভোগ অপরূপ[৩৭] জল।
গন্ধ চন্দন তথা অতীব নির্মল॥
নানা সুবাসিত জল তথা করে দান।
জথ দ্রব্য খাএ[৩৮] সব অমৃত সমান॥

---

২৮. বার্তা (মূলে—ভর্ত)—বৃত্তান্ত। মূলের 'ভর্ত' অর্থহীন।

২৯. শ ন (মূলে 'স ন')—এই দুই অক্ষরে 'শূন্য' গঠিত হইতে পারে। বলাবাহুল্য, শূন্যে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে অপরিষ্কৃত পবন বা অপবিত্র বায়ু পরিষ্কৃত বা পবিত্র হইয়া থাকে।

৩০. করহুঁ— সং. কুরুথ>করহ+ম্=করহম্ (আমি করি)>করহুঁ।

৩১. ভএ— ভয়ে (অপাদানে '-এ' বিভক্তি লক্ষণীয়); 'গুরু ভয়ে' গুরুর ভয় হইতে ভয় পাইয়া।

৩২. করিলুঁ— করিলাম। ৺ চন্দ্রবিন্দু উত্তম পুরুষের 'ম'-জ্ঞাপক।

৩৩. সমাধান— মীমাংসা; নিষ্পত্তি। সং. সম্+আ+√ধা+অনট্ (ভা)।

৩৪. পূজিল— অর্চনা বা আরাধনার অর্থে শব্দটি (ক্রিয়াপদটি) ব্যবহৃত হয় নাই। 'সংবর্ধনা' বা 'প্রশংসা' করার অর্থে ব্যবহৃত।

৩৫. বাখান—ব্যাখ্যান, বিস্তৃত বর্ণনা।

৩৬. ভুঞ্জাএ— ভোগ করায় (ণিজন্ত প্রয়োগ)। সং.√ভুজ=প্রা.√ভুঞ্জ্=বাং.√ভুঞ্জ+ণিচ্=ভুঞ্জায় (ভোগ করায়)।

৩৭. অপরূপ—সুন্দর, চমৎকার, অতুলনীয় অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ, ইহার প্রকৃত অর্থ 'অপ', (=অপগত অর্থে)+'রূপ' (=সৌন্দর্য)='অপরূপ'—কদাকার, বেয়াড়া। এই অর্থের স্থলে বাংলায় ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'অপূর্ব-সুন্দর', 'অতুলনীয়' প্রভৃতি। ইহা

কৌতুকে[৩৯] আছেন সভে[৪০] নাঞি[৪১] দুখসুখ।
মহা উপভোগ তথা নাঞি ভুমা ভুক[৪২] ॥
ভোগের কারণে তুলা দিল জে গোসাঞি।
এত উপভোগ আছে কোন মায়া নাঞি ॥ ৪৩
উৎপত্তি প্রলয়ে গোসাঞি করিবারে পারে।
ইহার সমতুল কহ কে পৃথিবী ভিতরে ॥
ইহার তুল্য কহি সুনহ মন করি[৪৪]।
স্বর্গের সমতুল সংসারে আছে ভরি ॥
আপন উপভোগ গোসাঞি দেখাবার তরে।
স্বর্গ তুল্য করিল মনুষ্য শরীরে ॥[৪৫]
পঞ্চমাস গর্ভ হৈলে জিউ[৪৬] জে বৈসএ[৪৭]।
নাড়ীর সঙ্গমে[৪৮] মাএর সত্ত[৪৯] পিঅএ[৫০] ॥
জথ জথ উপভোগ স্ত্রীলোকে দেএ[৫১]।
দিনে দিনে বাঢ়ে[৫২] সত্ত খাএ[৫৩] তা কায়াএ ॥

'বাগর্থ-বিজ্ঞানে' (Semantics) 'সুভাষণ' বা Euphemism নামে পরিচিত।

৩৮. খাএ— খায়। সং. খাদতি > খাজই > খাএ = খায় ('য়'-শ্রুতিতে)।

৩৯. কৌতুকে— আমোদ-প্রমোদে। 'কুতুক' শব্দ + ষ্ক = কৌতুক + এ। শব্দটির মূল অর্থ—কৌতূহল, ঔৎসুক্য।

৪০. সভে— সকলে (কর্তৃকারকে '-এ' বিভক্তি লক্ষণীয়)। উৎপত্তি—সংস্কৃত সর্ব > প্রা. সব্ব > বাং. সব = মধ্য বাং. 'সভ'; সম্ভবতঃ 'সভা' শব্দের প্রভাবে 'সভ' হইয়া ছিল।

৪১. নাঞি— ন + আসিত = নাসিত > নাহিঅ > নাহী > নাই = নাঞি (প্রথম বর্ণ 'ন' এর প্রভাবে মধ্য বাংলায় 'ঞ' বর্ণের আগম হইয়া থাকিবে।)

৪২. ভুক— ক্ষুধা। সং. বুভুক্ষা > ভুক্ষা > ভুক্‌খা > ভূখা > ভুখ = ভুক।

৪৩. ভোগের কারণে---মায়া নাঞি—শ্লোকটির অর্থ সুস্পষ্ট নহে। মনে হয়, ইহার মর্মার্থ এইরূপ :—'গোসাঞি' বা স্রষ্টা পৃথিবীতে এত বিচিত্র ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহার কোন তুলনা অন্যত্র নাই। এতৎসত্ত্বেও তিনি স্বয়ং তাহা হইতে নির্লিপ্ত। পৃথিবীর ভোগ-প্রাচুর্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্রষ্টা নিজের অক্ষোভ্য আসক্তিহীন সত্তাকে মানুষের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন।

৪৪. সুনহ মন করি—গৌরচন্দ্রিকায় টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৫. স্বর্গতুল্য করিল মনুষ্য শরীরে—মানুষের শরীরকে স্রষ্টা স্বর্গতুল্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যেন মানুষ স্বর্গের বস্তু ঐহিক জীবনে ভোগ করিয়া স্বর্গের মহিমা বুঝিতে পারে।

দশমাস দশ দিন তাহাক যা পালে।
ভূমিষ্ঠ হৈলে সভ বাহির করি ফেলে॥
উদরে রাখেন গোসাঞি করিআ প্রবন্ধ[৫৪]॥
পুষ্পের মধ্যেত জেন লুকাএ[৫৫] সুগন্ধ।
সেক জাহেদে কহে করিআ বিচারে[৫৭]।
ইহার অধিক গোসাঞি করিবারে পারে॥

৪৬. জিউ, জীউ—প্রাণ। হিন্দী কৃতঋণ (Loan) শব্দ ; সং. জীব>জীউ।

৪৭. বৈসএ— বসে=জন্মে। উৎপত্তি—সং. উপবিশতি>উবইসই>বইসই>বৈসএ>বসে।

৪৮. সঙ্গমে—সংস্রবে ; যোগে ; মিলনে। (করণে -'এ')

৪৯. সত্ত—সত্ত্ব=রস, নির্যাস। তুলনীয়—'ধুতুরার সত্ত্ব তাতে শিব দিল ঘসে'। (শিবায়ন)।

৫০. পিঅএ—পান করে। । সং. পিবতি>পিআই>পিঅএ।

৫১. দেএ— দেওয়া হয়। সং. দদাতি>দাই>দেই>দেএ।

৫২. বাঢ়ে—বৃদ্ধি পায়। সং. বর্ধতে>বড্ঢএ>বাঢএ>বাঢ়ে।

৫৩. খাএ—খায়। সং. খাদতি>খাঅই>খাএ>খায়।

৫৪. প্রবন্ধ— শব্দটির মৌলিক অর্থ {প্র+√বন্ধ্ (বন্ধন করা)+অল্(র্ম)}= সংগ্রহ, রচনা, সন্দর্ভ। এখানে ইহার অর্থ 'কৌশল'। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও তাই, যেমন,—'এ সব কাজের আগে জানিএে প্রবন্ধ' (কৃ. কী.)। অন্যত্র 'যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে। ব্রহ্মাবরে নিদ্রা যায় কিছু নাহি জানে।' (কৃত্তিবাস)।

৫৫. লুকাএ— লুকায়। ব্যুৎপত্তি—সং.√লুঞ্চ্ (অপনয়নে)=প্রা.√লুক্=বাং. √লুক (অদৃশ্য হওয়া)+এ (য)।

৫৬. উদরে রাখেন---লুকাএ সুগন্ধ—গোসাঞি মায়ের উদরে ব্রহ্মাকে নির্মাণ করিয়া এমন কৌশলে গোপনে রাখিয়া দেন যে, যেন পুষ্পের মধ্যে অদৃশ্যভাবে সৌরভ লুকাইয়া রাখা হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জন্মকথা'-র নিম্নোৎকলিত অংশটুকু মনে পড়ে—

'যৌবনেতে যখন হিয়া উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।"

৫৭. বিচারে— বিবেচনা।

সংসার রচিল গোসাঞি নানান প্রকার ।
কত জে রচিল হেতু না বুঝিলুঁ জার ॥ ৫৮
প্রভুর মায়াএ[৫৯] কেবা বুঝিবারে পারে ।
মরাকে জিয়াএ[৬০] প্রভু[৬১] জিয়ন্তকে[৬২] মারে ॥[৬৩]

এই সব জথ তত্ত্ব গোসাঞি থুইল[৬৪] ।
ইহার সমতুল সংসারে না দিল ॥
পৃথি সুরচিল প্রভু করিয়া সুসাজ[৬৫] ।
ইহার তুলনা দিল পক্ষিগণ মাজ[৬৬] ॥

---

৫৮. সংসার রচিল---না বুঝিলুঁ জার—অসংখ্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া গোসাঞি এই সংসারকে অপূর্বভাবে সাজাইয়াছেন। তাহার অনেক বস্তু সৃষ্টির কারণ আমি বুঝি নাই।

৫৯. মায়াএ— অনেকে 'মায়া'-র অর্থ 'ভ্রান্তি' বা 'বিভ্রম,' বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই পুস্তকে শব্দটি আরবী 'কুদরৎ' বা বাংলা 'ঐশী শক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬০. জিয়াএ—জীবন দান করে। সং.√জীব্=বাং.√জীয়া=জিয়া+এ।

৬১. প্রভু— প্র+√ভূ(হওয়া)+ডু(ক)=প্রভু—স্বামী, রাজা, মনিব। এখানে উক্ত অর্থে আরবী 'রব' (رب) শব্দের প্রতিশব্দ রূপে বাংলায় শব্দটি গৃহীত হইয়াছে।

৬২. জিয়ন্তকে=জীয়ন্ত-কে—জীব+বন্ত=জীববন্ত>জীয়ন্ত, জিয়ন্ত।

৬৩. মরাকে জিয়ায় প্রভু জিয়ন্তকে মারে—এই চরণটি কুরআন্ শরীফের—

تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی

নামক শ্লোকের অবিকল বঙ্গানুবাদ। ইহার অর্থ—'হে প্রভু তুমি মৃতকে জীবিত এবং জীবিতকে মৃত কর।'

৬৪. থুইল— রাখিল। সং. স্থাপিত+ইল্ল>থাবিঅ+ইল>থুইঅ+ইল>থুইল। কিন্তু, 'থোয়' বর্তমান কালের রূপের ব্যুৎপত্তি অন্যরূপ, যথা—সং. স্থাপয়তি>থাবেই>থোয়=রাখে।

৬৫. সুসাজ— সুসজ্জিত (করিয়া)। সুন্দরভাবে সাজাইয়া।

৬৬. মাজ= মাঝা—মধ্য। মধ্য>মজ্ঝ>মাঝ।

পক্ষিগণ হইয়া তারা মরা ডিম্ব পারে। ⎫ ৬৭
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখ সেই নাই মরে ॥ ⎭

—ইতি আদ্য পরিচয় সমাপ্ত—
জথা দৃষ্টং তোথা লিখিতং দোস নাস্তিকং।
লিখিতং শ্রী নেমাঞি চরন দাস

---

৬৭. 'আদ্য পরিচয়ের' এই শেষ শ্লোকটিতে পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের রহস্য অতি সংক্ষেপে একটি উপমার (পক্ষীর) সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় : এই পৃথিবীতে কিছুই জীবিত বা মৃত নহে ;—উভয়ই (জীবন ও মৃত্যু) সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান। তাই, প্রভুর ইচ্ছায় সুপ্ত জীবন পৃথিবীর বুকে জাগিয়া উঠে ; আবার তাহারই ইচ্ছায় জাগ্রৎ জীবনের মৃত্যু ঘটে। এই জন্ম মৃত্যুর আবহমান ধারার প্রকৃতি পক্ষী ও ইহার ডিম্ব প্রসব ও বাচ্চা ফুটানের ধারার অনুরূপ। পক্ষী যখন ডিম পাড়ে, তখন ডিমে জীবনের কোন সাড়া পাওয়া যায় না। অথচ পক্ষী ডিমগুলিকে নাড়াচাড়া করিয়া তা দিতে থাকিলে, তাহা হইতে জীবন্ত পক্ষী বাহির হইয়া আসে। এইরূপ কেয়ামতের দিন পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যখন পুনরায় সৃষ্ট হইবে, তখন সমস্ত জীবজন্তু আবার নব জীবন লাভ করিবে।